উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম

আবদুল মান্নান তালিব

উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম

আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩০১

১ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪২৩
পৌষ	১৪০৯
ডিসেম্বর	২০০২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩২.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

UPOMOHADESHE ENGREJ BERODHI SONGRAMER SHUCHONAY ULAMAYEH KERAM by Abdul Mannan Talib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 32.00 Only.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

আঠার শো সাতান্নর মুজাহিদ

লাল কেল্লার প্রাচীর গাত্র থেকে মায়া মমতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে এখন ফুটে উঠেছে তপ্ত তাজা লাল রক্তের চিহ্ন। এখন এ প্রাচীরগুলো দেখে মনে জাগছে আশংকা। সাতান্নর মুজাহিদদের হিম্মত ছিল হিমালয় সদৃশ। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল। ইলাহি বখশের মতো ঘরের শত্রু বিভীষণরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছিল।

মুজাহিদরা এক একবার জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে হামলা চালাচ্ছিল। কিন্তু তাদের বন্দুকের সব গুলী বের হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা শুধু শুধু খালি গাদা বন্দুকটি হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। তারা কোথায় যাবে ? কোথায় গিয়ে মাথাটি লুকাবে ? মাটি তার এ বীর সন্তানদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করছিল।

যে শহরে দিন রাত নহবত বাজতো, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই যে শহরের রাজপথ গলি-কুচা থেকে উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণে অন্ধকার উধাও হয়ে যেতো, যেখানে সমৃদ্ধি আর আনন্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না—সেই শহর আজ তার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য, প্রাচুর্য, আনন্দ, সমৃদ্ধি ও যাদুকরী তন্ময়তা সহকারে একটি সুগভীর খাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।—দিল্লীর ভাগ্যে শুধু থেকে গিয়েছিল আর্তনাদ, হা-হুতাশ আর করুণ ক্রন্দন।

দুপুরের ছায়া ছোট হয়ে লাল কেল্লার উঁচু প্রাচীরের গোড়ায় এসে ঠেকেছিল। ময়দানে প্রতিষ্ঠিত ফাঁসির দণ্ডগুলো থেকে বারবার লাশ নামানো হচ্ছিল। এক একদল মুজাহিদকে ঘেরাও করে আনা হচ্ছিল এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছিল। সূর্য যতই পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছিল ততই ক্যাপ্টেন উইলসনের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। সময় তার কাছে বড়ই দীর্ঘ ও ভারী মনে হচ্ছিল। এক একটি মিনিট ও সেকেণ্ড এক একটি বিশালায়তন পাহাড় হয়ে তার ওপর গড়িয়ে পড়ছিল। লেফটেন্যান্ট হাইন দুবার বললো ঃ

"স্যার ! আমি ডিউটিতে আছি। পূর্ণ স্কোয়াড এখানে প্রস্তুত আছে। আপনি গিয়ে আরাম করুন।"

কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলসন বারবার ফাঁসিদণ্ডগুলোর দিকে দেখতে লাগলো। শেষে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললো ঃ আরো দুজন আসামী আমি চাই। আরো দুজন। তাদের রক্তের ভেট না নেয়া পর্যন্ত আমার কলিজা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

মৃতদের সংখ্যা কম ছিল না। তাছাড়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অসংখ্য মুজাহিদ প্রহর গুণছিলেন ফিরিংগী ও মারাঠাদের ছাউনিগুলোতে। মোটা মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে তাদের হাত বাঁধা ছিল। বিষে চুবানো শাণিত সংগীনগুলো তাদের মাথার ওপর মৃত্যুদূতের মতো চমকাচ্ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলসন যাওয়ার আগে মূলচান্দ বেনিয়াকে দেখতে চাচ্ছিল। অবশেষে আশার আলো দেখা গেল।

মূলচান্দ বেনিয়া হাতীর হাওদায় বসেছিল রাজ রাজাড়ার মতো। সে মাহুতের ওপর কড়া হুকুম চালাচ্ছিল

"বর্শার খোঁচা মারো ! হাতীকে জোরে ভাগাও।"

লুৎফুল্লাহ মাহুত রাগে দাঁত পিশতে থাকে। হাতীকে সে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতো। তার হাতীর গর্দানে বর্শা মারার এবং তার হাতীর বর্শার খোঁচা খাবার অভ্যাস ছিল না। এ একান্ত অনুগত পশুটি তো তার ইশারায় দৌড়াতো কিন্তু এখন সে আর কী করতে পারে ! সময় বদলে গিয়েছিল। আগের সময় হলে সে এ ধরনের নির্দেশের জবাবে মূলচান্দের পেটে বর্শা বিঁধিয়ে দিতো। এক সময় এই মূলচান্দ বাদশার দরবারে হাযির হতো, বুকে হাত বেঁধে, মাথা ঘাড় এক হাত নত করে, বড়ই দীনতা ও আদবের সাথে এবং ভয়ে ভয়ে বলতো ঃ 'বান্দা–হাযির–জাঁহাপনা।' আর আজ সে-ই কিনা কেমন নির্ভিকভাবে বেহায়ার মতো তার পুরাতন প্রভুকে গালি দিয়ে যাচ্ছে। আবার মাহুতকেও ধমক দিচ্ছে। লুৎফুল্লাহ ও তার হাতী দুজনেই জানতে পেরেছিল, ভাগ্য এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাইতো আজ মূলচান্দের মতো নরকের কীটদের হুকুমের তাবেদারী করতে হচ্ছে তাদের।

হাতী বারবার হুংকার ছাড়ছিল। মাহুত বিশেষ তোশামুদি শব্দ উচ্চারণ করে প্রত্যেক বার তাকে ঠাণ্ডা করছিল। তার ক্রোধের আগুন নিভাতে মাহুতকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। তারা দুজন দুজনের মেজাজের সাথে পরিচিত ছিল। কিন্তু দুজনেই ছিল অসহায়।

ক্যাপ্টেন উইলসন দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে খুশীতে চিৎকার করে উঠলো ঃ "এ–এ–ই ! এটাই হচ্ছে মজার খেল।"

একথায় লেফটেন্যান্ট হাইন কেবল 'ইয়েস স্যার' বলে একবার মাথা দোলালো। হাতীটি ছিল বিশালদেহী ও দীর্ঘ, তার পশ্চাতে আগমনকারী দুজন মুজাহিদও ছিলেন দীর্ঘ ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের সারা শরীর ছিল ধূলোমাখা ও রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত। তবুও তাদের চেহারা থেকে এক অদ্ভুত ধরনের তেজ ও বীর্যের স্ফুরণ হচ্ছিল। তাদের দুহাত জড়ো করে বাঁধা ছিল

হাতীর পায়ের সাথে। কাজেই হাতী বর্শার ঘা খেয়ে তেজ কদমে দৌড়াতে থাকলে তার সাথে তাল রেখে তাদেরও দৌড়াতে হচ্ছিল। আর কেউ হলে এ ধরনের আহত শরীর নিয়ে এক কদমও চলতে পারতো না। কিন্তু তারা ছিল বড়ই হিম্মতওয়ালা। .... তাদের রক্ত ঝরে ঝরে পথের মাটি ভিজে যাচ্ছিল, আর তা আগত দিনের মাটিকে উর্বর করে তুলছিল।

মূলচান্দের মুখে ছিল তোশামুদির হাসি। খুশীতে সে ছিল বাগেবাগ। ক্যাপ্টেন উইলসনের কাছে তার ওয়াদা ছিল দুপুরের পরে আসার। সে তার ওয়াদা পূরণ করেছিল। মূলচান্দ কিছু দূরে হাতী থামালো। হাওদা থেকে নামলো। দৌড়ে ক্যাপ্টেন উইলসনের কাছে এলো। তার সামনে আভূমি নত হলো। ক্যাপ্টেন উইলসন কোমরে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুললো।

"হাম বা-হোট খোশ হ্যায়, মূলচানড ! টোম বড়া বড়া শায়টান পাকড় লায়া।"

"হুজুর, আমি যে ওয়াদা করেছিলাম !"

"ইয়ে 'ডো' শায়টান বাই হামাডের জান কা ডুশমন হ্যায়। ইস নে হামাডের বাহুট আডমি মারা হ্যায়।"

"হুজুরের সৌভাগ্যসূর্য উর্ধমুখী হোক ! হুজুর এদের মারেন, কাটেন, চিরে ফেলেন, ফেড়ে ফেলেন, এদের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেন, যা ইচ্ছে তাই করেন, এরা কি করতে পারে ?"

"টোম ঠিক বোলটা হ্যায় মূলচানড, হ্যাম ইন লোগ কা হান্টিঙ্গ কারেগা।"

একথা বলে ক্যাপ্টেন উইলসন মুজাহিদ ভাই দুজনের কাছে গিয়ে অত্যধিক ক্রোধে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ঃ "হামি টোমাডের কুত্তাকে মাফিক, মার ডালেগা।"

কিংবদন্তীর নায়ক দুই ভাই সাদুল্লাহ খান ও হাবীবুল্লাহ খান নিজেদের ছোট্ট মুজাহিদ বাহিনীর সাহায্যে গোরা, জাঠ ও মারাঠাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। বহু ইংরেজ সৈন্য তাদের হাতে নিহত হয়েছিল। এখন এই দুই সিংহদিল বীর মুজাহিদ কাপুরুষদের হাতে বন্দী হয়ে ফিরিংগী নেকড়েদের সামনে আনিত হয়েছিল। তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন উইলসন জোশের মাথায় লাফিয়ে তাদের সামনে গিয়ে সাদুল্লাহ খানের দাড়ি ধরে একটা ঝাঁকানি দিল। হাবিবুল্লাহ খান ক্যাপ্টেনের পেটে এমন একটা লাথি মারলো যে সে সেখানেই উল্টে পড়ে কঁকাতে লাগলো।

লেফটেন্যান্ট হাইন তার সৈন্যদের হুকুম দিল ঃ

"এদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাও।"

সৈন্যরা তড়িঘড়ি মুজাহিদদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলালো। আরো কয়েকটা রূহ দেহপিঞ্জর মুক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হলো। জিহাদের ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়ের ইতি হলো।

মূলচান্দ বেনিয়া বিরাট পুরস্কার লাভ করলো। লুৎফুল্লাহ মাহুতও পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার করতে পারলো না। মূলচান্দ তার ফিরিংগী প্রভুকে আর একটি খবর দিলো ঃ

"হুজুর ! সাদুল্লাহ খানের একটি ছেলে আছে। এখন তার বয়স চার বছর হলেও বড় হয়ে সে যে ফিতনা সৃষ্টি করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"ঠিক হ্যায় ! হাম উসকো খটম কারনা মাংগটা হ্যায়।"

"হুজুর যা চান ! আমি এখনি তাকে ধরে আনবো।"

মূলচান্দ জানতো সাদুল্লাহ খানের বিধবা ও তার চার বছরের শিশুটিকে মুসলমানরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। কাজেই সে লুৎফুল্লাহ মাহুতকে হুকুম দিল।

"বর্শার খোঁচা মেরে হাতীকে জোরে চালাও। লুৎফুল্লাহ ! আমি বড়ই খুশী হয়েছি, তুমি আমার সাথে সহযোগিতা করছো। তোমার কিসমত বদলে দেবো। তোমাকে আমরা বেশি পুরস্কার দেবো। বর্শার খোঁচা মারো। হাতীকে জোরে চালাও।"

"বেনিয়াজি ! তুমি কি কিসমত বদলাবে ? কিসমত তো ওপরওয়ালার হাতে।"

"তুই পাগল হয়ে গেছিস।"

হাঁ, সত্যি সত্যি লুৎফুল্লাহ পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। সে তার বর্শাটি আমুল বিদ্ধ করে দিল মূলচান্দ বেনিয়ার পেটে। মূলচান্দ নিচে পড়ে গেলো। তারপর লুৎফুল্লাহ তার হাতী চালিয়ে দিল ঘোড় সওয়ারদের ওপর। অসংখ্য সৈন্য নিহত হলো। অবশিষ্টরা পালিয়ে বাঁচলো। এরপর লুৎফুল্লাহর ভাগ্যে কি ঘটলো ঐতিহাসিকরা সে বিষয়ে নিরব।

উলামায়ে কেরাম রুখে দাঁড়ালেন

১৭৫৭ সালে একটি পাতানো প্রতারণা যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ এ উপমহাদেশের বুক থেকে মুসলিম শাসনের পতনের সূচনা করে। এর একশো বছর পরে ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম সম্মিলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন পাকাপোক্ত হয়। ১৮৫৭ সালে মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা চতুরদিকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শুধু ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে কর্মরত মুসলিম সৈনিকরা বিদ্রোহের আগুন জ্বালায়নি, বিভিন্ন ছোট বড় শহরের মুসলিম জনবসতির মধ্যেও এ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি একটি এলাকা ছিল উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলা। এ জেলার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের উদ্যোক্তা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, তাঁর উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, তাঁর পরোক্ষ মুরশিদ মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী এবং শেষোক্ত দুজনের মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

ইংরেজ পলটনের সাথে সরাসরি অস্ত্র যুদ্ধের আগে এঁরা এবং এঁদের হাজার হাজার শাগরিদ ও মুরিদান আর কোনো দিন অস্ত্র চালনা করেননি। মাত্র ২০ বছর আগে বালাকোটের ময়দানে মর্দে মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘটনা তাদের সামনে তখন একেবারে তরতাজা ছিল। এটাই ছিল তাঁদের জন্য জিহাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। তবে থানাভুন কসবার একটি ঘটনা তাঁদেরকে এ জিহাদে সাময়িকভাবে উদ্বুদ্ধ করে। থানাভুনের জনৈক প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত রইসের ছোট ভাই কাজী আবদুর রহীম ও তাঁর দলবলকে সাহারানপুরের ইংরেজ কালেকটর মিঃ স্পিংকী বিনা দোষে সাজানো মামলার মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ঘোষণা করে তড়িঘড়ি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। এ ঘটনায় থানাভুন, নানুতা এবং আশেপাশের কসবাগুলোর মুসলিম জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর বাসস্থানই তো ছিল থানাভুন। তিনি ছাড়া হাফেয যামেন, মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ থানভীও সেই মফস্বল শহরের বাসিন্দা ছিলেন। শহীদ কাজী আবদুর রহীমের বড় ভাই কাজী ইনায়েত আলী খান জনগণের এ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের উত্তেজনার খবর পেয়ে দূতের মাধ্যমে কাজী সাহেবের কাছে পয়গাম পাঠালেন ঃ 'ভুলে একটা ঘটনা ঘটে গেছে এতে উত্তেজনা ছড়াবার চেষ্টা না করে সবর করুন। আপনি প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা বাতিল করে দিলে আপনাকে থানাভুনের নওয়াব বানিয়ে দেয়া হবে।' কিন্তু ইংরেজের এ অস্ত্র ব্যর্থ হলো। থানাভুনে মুসলমানদের মজলিসে শুরা বসলো। হযরত গাংগুহী, নানুতবী ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এ শুরায় অংশগ্রহণ করলেন। আলোচনা চলছিল ঃ ঘটনা যেভাবে এগিয়ে চলছে এবং ইংরেজ শাসকরা যেভাবে নিজেদের তৈরি আইন ভঙ্গ করতে শুরু করেছে তাতে জিহাদ ফরয হয়ে গেছে কিনা।

কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব তাঁর 'রাজনৈতিক স্মৃতি কথায়' লিখছেন ঃ "এ অবস্থায় সবাই জিহাদের বিরোধী ছিলেন। একমাত্র মাওলানা কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহে আহ্বায়কের ন্যায় জিহাদের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি সবার জিহাদ বিরোধী যুক্তির এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন যার ফলে সবাই চুপ করে গেলেন। হযরত শায়খ মুহাম্মদ থানবীও এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (র)-এর ছাত্র এবং মাওলানা কাসেম নানুতবীর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি সর্বশেষ ওজর পেশ করে বললেন, জিহাদের মধ্যেও ইমামের প্রয়োজন। এখানে ইমাম কোথায় ? কার নেতৃত্বে আমরা জিহাদ করবো ? এ প্রশ্নটা ছিল ইসলামী প্রাণ সত্তার পূর্ণ অনুসারী। সম্ভবত শায়খ থানবী সাহেবের ধারণা ছিল এ জিহাদের জন্য কাজী ইনায়েতুল্লাহর নেতৃত্ব জিহাদের নেতৃত্বদানের সমস্ত শর্ত পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। কাজেই নেতৃত্বের শর্তই যেখানে পুরা হচ্ছে না সেখানে জিহাদ ফরয হবার দাবী করা যেতে পারে না। ফলে মজলিসে শুরার অধিকাংশ সদস্য এ পর্যন্ত জিহাদ বিরোধী যে রায় পেশ করে এসেছেন তা মেনে নেয়া হবে। কিন্তু হঠাৎ মাওলানা কাসেম নানুতবী (র) বলে উঠলেন ঃ ইমাম বানিয়ে নেয়া আর এমন কি কঠিন কাজ। হাজী সাহেব এখানে রয়েছেন। আসুন আমরা সবাই জিহাদের জন্য তাঁর হাতে বাই'আত হই।"

মাওলানা কাসেম নানুতবীর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল থানাভুনের মসজিদে মীর মুহাম্মদ সাহেবের হুজুরায় বসবাসকারী এক কপর্দকহীন ফকীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বরকতপূর্ণ সত্তার প্রতি। সমগ্র মজলিস নিরব। কারোর মুখে আর কোনো কথা যোগাল না। সবাই এক বাক্যে হাজী সাহেবকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের ইমাম ও কমাণ্ডার ইন চীফ বানালেন এবং তাঁর হাতে বাই'আত করলেন। সিদ্ধান্ত হলো ঃ হাজী সাহেব

হবেন জিহাদের বাই'আতের কেন্দ্রীয় নেতা। হাফেয মুহাম্মদ যামেন হবেন প্রধান পতাকাবাহী। মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী হবেন মুজাহিদদের প্রধান দীনী প্রশিক্ষক। তিনি ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে মুজাহিদদেরকে গ্রাম থেকে মফস্বল শহরে আনবেন। মাওলানা কাসেম নানুতবী হবেন প্রধান সেনাপতি। মুজাহিদদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তাদেরকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করা এবং জিহাদের খরচ বহন করার দায়িত্ব পালন করবেন কাজী ইনায়েত আলী খান। অর্থাৎ তিনি হবেন মুনতাযিম।

ইংরেজ সেনাদলের সাথে জিহাদ শুরু হয়ে গেলো। জিহাদের সূচনা হলো একটি অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে। মুজাহিদরা খবর পেলো, কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য ভারা বেহারাদের কাঁধে করে কয়েক ভারা কার্তুজ সাহারানপুর থেকে কেরানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদরা সহজ সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না। ফলে ইনায়েত আলী খানের নেতৃত্বে একটি মুজাহিদ বাহিনী ইংরেজ সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত কার্তুজ লুটে আনলো। একজন ইংরেজ সৈনিক সংঘর্ষে নিহত হলো।

থানাভুনের মুজাহিদদের এটা ছিল প্রথম হামলা ও প্রথম সাফল্য। এ লড়াইয়ের খবর মুযাফফর নগরে পৌঁছে গেলো। মুযাফফর নগর জেলার শাসক থানাভুনের ওপর আক্রমণ করার হুকুম জারী করে দিল। ওদিকে শামলীর দিকে ইংরেজ সৈন্যের মার্চের খবর শুনে থানাভুনে যুদ্ধের নাকাড়া বেজে উঠলো এবং মুজাহিদরা শামলী আক্রমণ করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হলো। শামলী বহু ইসলামী প্রতিভার জন্মদাতা কসবা 'কান্ধলা' এর অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে ছোট একটা গড় আছে। মুজাহিদরা এ গড় আক্রমণ করে সেটা দখল করে নিল। এ যুদ্ধে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শামলীর গড় দখল

শামলীর এ গড় দখল করার সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত উদ্দীপনাময়। দেশের হক পরস্ত উলামায়ে কেরাম ছিলেন এ সংগ্রামে প্রথম কাতারের সৈনিক। উত্তর প্রদেশের মুযাফফর নগর ও সাহারানপুর জেলায় উলামায়ে কেরামের এ সংগ্রাম ছিল সবচেয়ে জোরদার। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন দেওবন্দ মাদ্রাসার (দারুল উলুম) প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মাওলানা কাসেম সাহেব এক পর্যায়ে দিল্লীর সাথেও যোগাযোগ করেন। তিনি মুরাদাবাদের নওয়াব সাহেব শাব্বির আলী খানের মাধ্যমে দিল্লীর শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ

করেন। তিনি বাদশাহকে একথাও জানান, থানাভুন ও শামলী থেকে জিহাদ করতে করতে আমরাও দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবো।

শামলীতে তাঁরা ইংরেজ সেনাদের গড় ঘেরাও করেন। মাওলানা মুনীর নানুতবী নিজে এ জিহাদে শরীক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মাওলানা মনসুর আনসারীকে এ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "এ তুমুল যুদ্ধে মাওলানা কাসেম সাহেব যুদ্ধক্ষেত্রের এক কিনারায় ক্লান্তি দূর করার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেনাদলের একজন সিপাহী, চেহারা সুরাতে শিখ মনে হচ্ছিল, স্বাস্থ্যও তেমনি হাট্টাকাট্টা জোয়ান, মাওলানা কাসেমের মতো অন্তত চারজন হলে তবে তার সমান হতে পারে, হঠাৎ তাকে দেখেই ক্রোধে আগুনের গোলার মতো হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সে চীৎকার করে উঠলো ঃ তোমরা বড় বেশি বেড়ে গেছো মৌলভী। এবার এসো আমার সাথে মোকাবিলা করো। শিখের হাতে তলোয়ার ছিল। সে বাতাসে তলোয়ারটি একপাক ঘুরিয়ে আবার ক্রোধে ফেটে পড়লো ঃ আরে–মৌলভী ! এ তলোয়ার তোর জন্য মৃত্যুর পয়গাম। এই বলে সে দুধারী তরবারি হাতে নিয়ে মাওলানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।

হঠাৎ মাওলানা কাসেম চীৎকার করে উঠলেন ঃ ওরে বেকুব ! তুই আমাকে কি মারবি ? তোর পেছনটা আগে সামলা !

শিখ সৈন্যটি পেছন ফিরে দেখলো। তার পেছন ফেরার সাথে সাথেই মাওলানা বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে নিজের তোলায়ার দিয়ে জোরসে মারলেন তার কাঁধে। এক মারেই তার কাঁধ থেকে তেরছাভাবে নেমে একদম কোমর পর্যন্ত দুফাঁক হয়ে গেলো।

এভাবে চতুরদিক থেকে ব্যাপকভাবে মার খেয়ে ইংরেজ সৈন্যরা গড়ের কেল্লার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। মুজাহিদরা কেল্লা অবরোধ করলো। এই গড়ের মধ্যে একটি মসজিদ ছাড়া বাকি সবটুকুই ছিল চাটিয়াল ময়দান। মসজিদটি ছিল ঠিক কেল্লার ফটকের দিকে। বাইর থেকে আক্রমণকারীদের সামনে মসজিদটি ছাড়া আর কোনো আড়াল ছিল না। ফলে ইংরেজ সৈন্যরা কেল্লার মধ্য থেকে এবং পাঁচিলের ওপর থেকে বেদম গুলী চালাচ্ছিল এবং ফাঁকা ময়দানে অসংখ্য মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করছিল। এটা বড় কঠিন সময় ছিল। ময়দান থেকে ভাগতে কেউ প্রস্তুত ছিল না। গুলী তাদের বুকে ছেঁদা করে শরীরের ভেতরে চলে যেতো। প্রাণ বায়ু বের হয়ে যেতো। কিন্তু একজন মুজাহিদও এজন্য ভীত ছিল না। মুজাহিদরা ঘুরেফিরে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতো। ক্লান্তি নিবারণ করার এই একটি মাত্র জায়গাই ছিল। কিন্তু সেখান

থেকে বের হলেই নির্ঘাত মৃত্যু। কি করা যায়। অনেক চিন্তা ভাবনা করা হলো। কিন্তু কোনো উপায়ই বের করা গেল না। হঠাৎ মাওলানা কাসেম সাহেবের মাথায় একটি চিন্তা এলো। প্রাণ দিয়ে হলেও তিনি সেই চিন্তাটি কার্যকর করার উপায় স্থির করলেন।

মসজিদটি ছিল কেল্লার দরজার দিকে। দরজার কাছেই ছিল একটি আট চালা। সম্ভবত ইংরেজ সৈন্যদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছিল। চালাটার ওপর তাঁর নজর পড়লো। তিনি ভাবলেন যদি গুলী বৃষ্টির মধ্য দিয়ে একবার ঐ চালা পর্যন্ত পৌছানো যায় তারপর ওটাকে উপড়ে নিয়ে কেল্লার দরজার গায়ে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায় তাহলে নির্ঘাত কেল্লার দরজা পুড়ে যাবে। তখন কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে ইংরেজ সৈন্যদেরকে পরাস্ত করা মুজাহিদদের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু মসজিদ থেকে আটচালা পর্যন্ত পৌছানোই ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কেল্লার দরজায় এবং পাঁচিলের ওপর বন্দুক ও তলোয়ার নিয়ে ইংরেজ সৈন্যরা কড়া পাহারা দেবার সাথে সাথে আক্রমণও চালাচ্ছিল। কাজেই সেদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেই তড় তড়া তড় .... করে এমনভাবে গুলী বর্ষিত হবে যার ফলে মাঝ পথেই সবার দফারফা হয়ে যাবে। কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই। অটল সংকল্পের সামনে পাহাড়ও টলে যায়। আর এ ধরনের পরিস্থিতিই তো অসম সাহস ও বিপুল হিম্মতের পরীক্ষা করে থাকে।

মাওলানা কাসেম যে পরিকল্পনাটি তৈরি করলেন সেটির বাস্তবায়নের সংকল্পও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দিলেই পয়দা করে দিলেন। তিনি এজন্য দ্বিতীয় কোনো সাথীর সহযোগিতাও কামনা করলেন না। হঠাৎ দেখা গেলো, আকাশের বিজলী চমকের ন্যায় প্রচণ্ড গুলী বৃষ্টির মধ্য দিয়ে মাওলানা কাসেম আটচালা পর্যন্ত পৌছে গেছেন। অতি দ্রুত তার বাঁধনগুলো কেটে সেটি আলাদা করে নিয়ে দৌড়ে কেল্লার দরজার গায়ে লাগিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন লাগার সাথে সাথেই ফটকের সমস্ত কাঠ জ্বলে উঠলো। পাহারাদার সৈন্যরা সেখান থেকে পালিয়ে গেলো। আগুন নিভাবার হিম্মত কারোর হলো না। এভাবে কেল্লার বন্ধ দরজা মুজাহিদদের জন্য খুলে গেলো। তারা নারায়ে তাকবীর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। এ সময় অবরুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তলোয়ার নিয়ে সামনাসামনি লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। এভাবে মুজাহিদরা বন্দুকের পরিবর্তে এবার হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। দেখতে দেখতে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেলো। ইংরেজ সেনা পরাজিত হলো। শামলী দুর্গ মুজাহিদরা দখল করে নিল।

এ যুদ্ধে বহু মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন এবং এই সংগে শাহাদত বরণ করেন শামলী আক্রমণকারী মুজাহিদ সেনার আমীরে লশকর হাফেয মুহাম্মদ যামেন সাহেব। তাঁর লাশ থানাভুনে পৌছার সাথে সাথে সমগ্র শহর ভেঙ্গে পড়লো এবং মিছিল সহকারে লাশ শহরে নিয়ে গেলো। হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর লাশ দেখেই উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেনঃ "যে জন্য এ সবকিছু হলো সেটাই পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ শাহাদাত লাভই ছিল মূল লক্ষ্য এবং হাফেয যামেন সাহেব সেই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।"

কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব লিখেছেন ঃ এদিকে হাফেয যামেন সাহেব শহীদ হলেন আর ওদিকে দিল্লী থেকে খবর এলো, বাদশা বাহাদুর শাহ গ্রেফতার হয়ে গেছেন এবং দিল্লী পুরোপুরি ইংরেজের কবজায় চলে গেছে।

ব্যর্থতার পর

১৮৫৭ সালে হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয় শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের গ্রেফতারী ও ইংরেজদের দিল্লী পুনরদখলের মধ্য দিয়ে। দিল্লী পুনরায় দখল করার পর ইংরেজদের প্রতিশোধ স্পৃহা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ফলে মুসলমানদের ওপর যেন কিয়ামত নেমে আসে। প্রভাবশালী, যোগ্যতা সম্পন্ন ও সক্ষম-সক্রিয় মুসলমানদের ওপর সর্বত্র জুলুম নির্যাতন চলতে থাকে। বিশেষ করে গ্রেফতারী ও হয়রানী চলতে থাকে ব্যাপকভাবে। 'তাযকিয়াতুর রশীদ' গ্রন্থের লেখক মাওলানা আশেক ইলাহী মীরাঠির বর্ণনা থেকে জানা যায় ঃ শামলী, থানাভুন ও মুযাফ্ফর নগরের ঘটনাবলীর কারণে গোয়েন্দা বিভাগ ইংরেজ সরকারকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এ এলাকার বিদ্রোহ, যুদ্ধ ও অন্যান্য যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী দায়ী। তাঁরাই এসব কার্যকলাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের শাস্তি দেবার জন্য ইংরেজদের সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী এগিয়ে এলো।

মাওলানা আশেক এলাহী লিখছেন ঃ সুবহে সাদেকের পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যরা থানাভুন অবরোধ করলো। তারা দূর পাল্লার কামানের সাহায্যে শহরের ওপর গোলা বর্ষণ করতে লাগলো। জবাবে মুসলমানরাও কামানের মুখ তাদের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ঘটনাক্রমে মুসলমানদের কামানের একটি গোলা ইংরেজদের কামানের ঠিক মাথায় গিয়ে পড়লো। ফলে কামানটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। কিন্তু মুসলমানদের এ আনন্দ ছিল সাময়িক। কারণ ইংরেজদের যোগানের অভাব ছিল না। ইংরেজদের বিপুল গোলা বর্ষণের মোকাবিলা করার মতো গোলা বারুদ থানাভুনের মুসলমানদের কাছে ছিল না। ফলে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই ইংরেজ সেনারা কসবার মধ্যে ঢুকে পড়লো। হত্যা, লুণ্ঠন ও জ্বালানো পোড়ানো চলতে থাকলো ব্যাপকভাবে। কেরোসিন তেল ঢেলে মুসলমানদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। বিপদগ্রস্ত মুসলমানরা ঘর থেকে বের হয়ে পালাতে থাকলে তাদের মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করে তাদেরকে হত্যা করতে থাকলো। আশেপাশের অমুসলিম গ্রামগুলো মুসলমানদের এ দূরবস্থা দেখে ইংরেজদের সাথে যোগ দিল। তারাও মুসলমানদের বাড়ি ঘর ব্যাপকভাবে লুট করতে ও তাদেরকে হত্যা করার কাজে মেতে উঠলো।

আমীরে জিহাদ হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী ও মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হলো। তাদের গ্রেফতারের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হলো। ফলে চতুরদিকে লোকেরা তাদের খোঁজ করে ফিরতে লাগলো। ইতিমধ্যে তাঁরা তিনজনই আত্মগোপন করেছিলেন। মাওলানা কাসেম সাহেব দেওবন্দেই ছিলেন। তিনি শ্বশুর বাড়ির আলীশান বিলডিংয়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তিন দিন পূর্ণ হবার পরপরই তিনি হঠাৎ বাইরে বের হয়ে এলেন এবং খোলামেলা চলাফেরা করতে লাগলেন। লোকেরা যতই বলে আপনি আত্মগোপন করুন, ইংরেজ সেনারা আপনাকে খুঁজে ফিরছে, ততই তিনি নির্ভীকভাবে চলাফেরা করতে থাকলেন। তিনি বললেন, তিন দিনের বেশি আত্মগোপন করে থাকা সুন্নত থেকে প্রমাণিত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাতের সময় সওর গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করেছিলেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহে আলাইহি মক্কায় হিজরত করার জন্য সিন্ধুর পথে পাড়ি জমালেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহে আলাইহি রামপুর মিনহাঁরায় তাঁর জনৈক চিকিৎসক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে যে কোনো মুহূর্তে তাঁর গ্রেফতারীর সম্ভাবনা ছিল। মাওলানা কাসেম সাহেব পরে দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজরা মাওলানার শ্বশুর বাড়িতে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হবার পর গোয়েন্দা মুখে খবর পেয়ে দেওবন্দেরর ছাত্তা মসজিদে হানা দিল। এখানে এসে তারা মসজিদ অবরোধ করলো।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন পুলিশদের সাথে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। মাওলানা তখন মসজিদে পায়চারি করছিলেন। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি মাওলানার উপরে পড়লো এবং মাওলানাও ক্যাপ্টেনকে দেখলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন মাওলানাকে চিনতো না। সে মাওলানাকেই জিজ্ঞেস করলো ঃ "কাসেম কোথায় ?"

মাওলানা এক কদম পিছিয়ে গিয়ে জবাব দিলেন ঃ "এখনই তো এখানে ছিল। দেখুন, খুঁজে দেখুন কোথায় আছে।"

মাওলানা তখন পায়চারী করছিলেন। আর পায়চারীকারীর প্রতিটি পদক্ষেপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হয়। সে প্রথমে যেখানে পা রেখেছিল পরবর্তীবারে আর সেখানে পা রাখে না। ফলে মাওলানা আগের ছেড়ে দেয়া জায়গার দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন যে, কিছুক্ষণ আগে কাসেম সাহেব তো এখানেই ছিলেন। তাঁর এ বলাটা মোটেই মিথ্যা ছিল না।

ক্যাপ্টেন তার পুলিশ বাহিনী নিয়ে মসজিদের এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করতে লাগলো। ইত্যবসরে মাওলানা নিশ্চিন্তে মসজিদ থেকে বের হয়ে পুরিশের ঘেরাও অতিক্রম করে নিকটবর্তী শাহ্ রমযূ উদ্দীন মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন। ক্যাপ্টেন মসজিদের মধ্যে খোঁজাখুজি শেষ করে মাওলানাকে যেতে দেখে বললো ঃ "ঐ লোকটিই তো মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী বলে মনে হচ্ছে।" ফলে পুলিশ এবার শাহ্ রমযূ উদ্দীন মসজিদটিও ঘেরাও করলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার মাওলানা এখানেও কিভাবে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বের হয়ে এলেন এবং পাশের অন্য একটি মসজিদে আশ্রয় নিলেন।

পুলিশ মাওলানার পেছনে জোঁকের মতো লেগে ছিল। এ অবস্থা দেখে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই শায়খ নিহাল আহমদ তাঁকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মাওলানা রাজী হলেন। দেওবন্দ থেকে বের হয়ে তিনি চাকওয়ালী গ্রামে পৌছে গেলেন। এ গ্রামটি ছিল দেওবন্দ ও নানুতার মধ্যবর্তী সড়কটির পাশে। কিন্তু তাঁর এ গ্রামে আশ্রয় নেবার খবর বেশি দিন চাপা রইলো না। একদিন পুলিশ চাকওয়ালী গ্রাম ঘেরাও করলো। পুলিশ দেখে শায়খ নিহাল আহমদ সাহেব পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি বার বার বলতে থাকলেন ঃ "হায় ! হায় ! আমার গ্রাম থেকে মাওলানা গ্রেফতার হয়ে যাবেন। অথচ আমিই তাঁকে জোর করে এখানে এনেছি।"

শায়খের পেরেশানী দেখে মাওলানা তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ "এভাবে ভীত হয়ে আপনি তো আমাকে গ্রেফতার করিয়েই দেবেন দেখা যাচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন, আমি নিজেই নিজের রক্ষার ব্যবস্থা করে নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ।"

একথা বলেই মাওলানা বাইরে বের হয়ে এলেন। সামনে ইংরেজ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। মাওলানা কোনো প্রকার আশংকা প্রকাশ না করে হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন ঃ

"আসুন, আসুন, ভিতরে তাশরীফ আনুন !"

ইংরেজ ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে মাওলানার পেছনে পেছনে গৃহের পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত অংশে প্রবেশ করলো। মাওলানা ভেতরে গিয়ে হুকুম দিলেন ঃ চা-নাশতা তৈরি করো। চা-নাশতা তৈরি হয়ে এলো। ক্যাপ্টেন ও তার সাথের অফিসারদের আপ্যায়ন করা হলো। ক্যাপ্টেন মাওলানার সাথে আলাপ করে খুব খুশী হলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি মাওলানা কাসেমকে চেনেন?"

জবাবে মাওলানা বললেন ঃ "জী হাঁ, আমি তাকে খুব ভালো করে জানি।"

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন বললো ঃ আমি একটু ভিতর বাড়িতে যানান খানার তল্লাশি নিতে চাই।

মাওলানা জবাব দিলেন ঃ আসুন, নিশ্চিন্তে তল্লাশী নিন। ফলে গৃহের সব জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। ফল যা হবার তা হলো। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে মাওলানা নিজেই ইংরেজদের সাথে তল্লাশীতে শরীক রইলেন। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ক্যাপ্টেন তার দলবল নিয়ে বিদায় নিল। মাওলানাও অন্যদিকে রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর গিয়ে ক্যাপ্টেন গোয়েন্দাকে শাসালো ঃ তুমি সবসময় ভুল খবর দাও। গোয়েন্দা কাঁচুমাচু করে বললো ঃ হুযুর, খবর তো মিথ্যা নয়। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে বাড়ি তল্লাশী করে দেখালো সে-ই মাওলানা কাসেম। ক্যাপ্টেন ওয়ারেন্ট বের করে হুলিয়া মিলিয়ে দেখলো। সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। ফলে দৌড়াতে দৌড়াতে আবার চাকওয়ালী এসে পৌছলো। কিন্তু হা হতোস্মি ! তখন চিড়িয়া উড়ে গেছে।

মাওলানা গাংগুহী গ্রেফতার হলেন

মাওলানা কাসেম সাহেবকে গ্রেফতার করার জন্য ইংরেজদের অভিযানের ব্যর্থতা এবং ইংরেজ ক্যাপ্টেন ও স্থানীয় শিখ ও হিন্দুদের হয়রানি ও পেরেশানির কথা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। এবার মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর গ্রেফতারের সাথে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা আলোচনা করবো।

হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব মক্কা মুয়ায্‌যমায় হিজরাত করার পোখ্‌তা ইরাদা করে ফেলেছেন শুনে মাওলানার গাংগুহী পাঞ্জসালায় তাঁর খেদমতে হাযির হন। মাওলানা তাঁকেও সাথে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু হাজী সাহেব এক কথায় বলে দেন ঃ যাও তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দিলাম। মাওলানা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঞ্জসালা থেকে গাংগুহে ফিরে আসেন। সেখানে এসে দেখেন সবাই পেরেশান। কারণ ইতিপূর্বেই মাওলানার গ্রেফতারীর পরোয়ানা জারী হয়ে গেছে এবং পুলিশ যে কোনো মুহূর্তেই গাংগুহে চলে আসতে পারে। এসব কথা শুনেও মাওলানা রশীদ আহমদ অটল পাহাড়ের মতো নিশ্চিন্তে বসে থাকেন। তিনি কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের চাপে অবশেষে তাঁকে তাঁর দুধ ভাইয়ের দেশ রামপুর মিনহারানে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি হাকিম যিয়াউদ্দিন সাহেবের গৃহে অবস্থান করতে থাকেন।

কিছুদিন পর সত্তরজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে কর্নেল গর্ডন গাংগুহে পৌঁছে যান। তার সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল শিখ। সৈন্যরা সমস্ত এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঘরে ঘরে ঢুকে মাওলানা রশীদ আহমদকে খুঁজতে থাকে। মাওলানার মামাতো ভাই মৌলভী আবুন নসর মাওলানাকে ভীষণ ভালবাসতেন। মাওলানার পরিণাম চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত ও চিন্তান্বিত হন। তিনি মসজিদের এক কোণে মাথা নত করে মুরাকাবায় বসেন এবং এক মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকেন। একজন শিখ সৈন্য মসজিদে প্রবেশ করে তাকে দেখতে পায়। তার ঘাড়ে জোরে এক থাপ্পর বসিয়ে গর্জে ওঠে, 'কি, মাথা হেঁট করে বসে কি করা হচ্ছে? চলো, উঠে পড়ো!' মৌলভী আবুন নসরের লেবাস পোশাক ও চেহারা সুরাতে মাওলানা রশীদ আহমদের সাথে ছিল আবার অদ্ভূত রকমের মিল। কাজেই সনাক্তকারীর পক্ষে তাঁকেই রশীদ আহমদ মনে করাটা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। মজলুম আবুন নসর সাহেব মাথা উঠিয়ে একবার চারদিকে দেখে নেন এবং নিজেকে যমদূতের হাতের মুঠোয় গ্রেফতার দেখে সিপাহীর কথামতো তার পেছনে পেছনে চলতে

থাকেন। মৌলভী আবুন নসর সৈন্যদের হাতে লাঞ্ছনা সয়ে বন্দুকের বাঁটের মার খেতে খেতে জেলখানায় পৌছেন। কিন্তু তিনি যে রশীদ আহমদ নন একথা একবারও মুখ ফুটে উচ্চারণ করেননি। পরে ইংরেজ কর্নেল সাহেব কিভাবে জানতে পারেন কয়েদী আসল আসামী নয় এবং আসল আসামী রামপুর মিনহারানে আত্মগোপন করে আছেন। ফলে মৌলবী আবুন নসর মুক্তি লাভ করেন। শুনা যায়, রামপুরে মাওলানার আত্মগোপনের খবর ইংরেজদের জানায় হাকিম আহমদ আমীর বখশ।

১২৭৫ হিজরীর শেষ দিকে বা ১২৭৬ হিজরীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ইংরেজী সনের ১৮৫৯ এর প্রথম দিকে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীকে রামপুর মিনহারান থেকে গ্রেফতার করা হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে। কাজেই মাওলানার গ্রেফতারী ও তার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা উভয়টি চলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর। মাওলানাকে সাহারানপুর জেলে আটক করা হয়। কয়েকদিন কালকুঠরী ও জেলখানায় আটক থাকার পর মাওলানার কেস তদন্তকারী আদালতে পেশ করা হয়। সেখানে বেশ কিছু শুনানী ও তদন্ত হবার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, এটা থানাভুনের কেস, কাজেই মুযাফ্ফর নগরের আদালতে এর বিচার হবে। ফলে সৈন্যদলের নাংগা তলোয়ারের ছায়ায় মাওলানাকে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে মুযাফ্ফর নগরে পৌছাবার ব্যবস্থা করা হয়। এ খবর যে কোনোভাবে দেওবন্দ এলাকার মসজিদে আত্মগোপনকারী মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর কানে পৌছে। তিনি পুরাতন সাথীর সাথে দেখা করার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে মুযাফ্ফর নগর যাবার পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। হঠাৎ দেখতে পান দু হাত মোটা লোহার শিকলে বাঁধা এবং দুপায়ে ভারী লোহার জিঞ্জির পরে হিন্দুস্তানের মুহাদ্দিসে আযম তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ ও সেনাদলের পাহারা ছিল। কথা বলাতো দূরের কথা ইশারা ইংগিত করাও সম্ভব ছিল না। দূর থেকেই দুজন দুজনকে দেখেন, চোখে চোখে সালাম বিনিময় ও চোখে চোখেই কথা এবং ভাবের বিনিময় হয়। একজন মুযাফ্ফর নগর জেলার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন আর একজন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাঁকে দেখতে থাকেন।

কারাগারেও নিশ্চেষ্ট নন মর্দে মুজাহিদ

মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুযাফ্ফর নগর কারাগারে ছমাস থাকেন। এখানে তাঁর দৃঢ়তা, অবিচল সত্যনিষ্ঠা, তাওয়াক্কুল, সবর, তাকওয়া, সাহস, হিম্মত এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিস্ময়কর ভালোবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়। কারাবাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদিনও তিনি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করেননি। কারাগারে তিনি নিয়মিতভাবে পাক-পরিচ্ছন্ন পানি পেতেন এবং তা দিয়ে অযু ও গোসল সেরে নিতেন। কিছু দিনের মধ্যে কারাগারের অন্যান্য কয়েদীরা, মজলুম, সাজাপ্রাপ্ত ও আটক বন্দীদের বিরাট দল তাঁর ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। তাদের একটি বিরাট অংশ জেলখানার মধ্যে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে।

মাওলানা গাংগুহী কারাগারের মধ্যে নিয়মিত জামায়াতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা করেন। কয়েদীদের সবসময় দীনদারী ও সত্যনিষ্ঠ জীবনের নসিহত করতেন। তাদের বাহ্যিক আমল আখলাক শুধরাবার সাথে সাথে অন্তরদেশও ঈমানের নূরে ভরে দেবার চেষ্টা করতেন। একজন সাচ্চা মুসলিম ও মর্দে মুজাহিদ কারাগারের মধ্যে গিয়েও নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেন না। কাজেই তিনি সর্বক্ষণ নিজের জেলখানার সাথীদের ওয়াজ নসিহত করতেন, তাদের নিয়মিত কুরআনের তাফসীর শুনাতেন। এক আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানাতেন। কখনো নিজে যিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। কখনো সাথীদের সবর করার উপদেশ দিতেন। কখনো শোকর করতে বলতেন।

বিচারের জন্য আদালতে হাযির করা হলে সরাসরি ও নিশঙ্ক চিত্তে ইংরেজ বিচারকের সাথে কথা বলতেন। বিচারক যা জিজ্ঞেস করতেন কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ না করে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিতেন। কখনো কোনো কথা আমতা আমতা করে বা অস্পষ্টভাবে বলতেন না। জান বাঁচাবার জন্য কোনো দুর্বল মুহূর্তেও কোনো প্রকার বাহানাবাজী বা চালাকির আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেননি। সবসময় সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলতেন। যা সত্য যথার্থ তাই বলতেন।

কখনো তাঁকে প্রশ্ন করা হতো ঃ রশীদ আহমদ, তুমি দুষ্কৃতকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো এবং নিজেই দুষ্কর্মে অংশ নিয়েছো ?

তিনি জবাব দিতেন ঃ দুষ্কর্ম করা আমার কাজ নয় এবং দুষ্কৃতকারীদের সহযোগীও আমি নই।

কখনো প্রশ্ন করা হতো ঃ তুমি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছ ?

তিনি নিজের তসবীহের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, এটিই তো আমার অস্ত্র।

কখনো বিচারক ধমক দিতেন ঃ তোমাকে পূর্ণ শাস্তি দেয়া হবে।

মাওলানা তার জবাবে বলতেন ঃ তাতে কি আসে যায় ? তবে অনুসন্ধান চালিয়ে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে তবে শাস্তি দেবেন।

মোটকথা ইংরেজ সরকার সবরকম তদন্ত চালায়। ধুরন্দর গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োগ করে। সরকার তার সমস্ত ক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যবহার করেও মাওলানার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও সত্য প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজ সরকারের কাছে মাওলানার বিরুদ্ধে কোনো সত্য সাক্ষীও ছিল না। সব সাক্ষীই ছিল জাল ও বানোয়াট। সাক্ষীদের কেউই মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর মর্যাদা ও ইলমীয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। শামলীর জিহাদে তাদের একজনও মাওলানাকে শরীক হতে স্বচক্ষে দেখেনি। অগত্যা ইংরেজ বিচারক অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

আসলে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, মাওলানা গাংগুহী এভাবে বেকসুর খালাস হয়ে যাবেন। অন্যদের কথাতো আলাদা, মাওলানার পীর ও মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ধারণা ছিল ইংরেজ সরকার মাওলানা রশীদ আহমদকে বিদ্রোহের অভিযোগে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে জানা যায়, যে সময় মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব কারাগারে ছিলেন, সে সময় একদিন হাজী সাহেব তাঁর এক খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন, "মিঁয়া, কিছু শুনেছ কি ? মৌলভী রশীদ আহমদের কি ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে ?"

খাদেম জবাব দেয় ঃ "হুযুর, ঠিক বলতে পারছি না, এখনো তো তেমন কোনো খবর পাইনি।"

জবাব দেন ঃ "হ্যাঁ, হুকুম হয়ে গেছে চলো।"

একথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ান। তখন ছিল বর্ষাকাল। মাগরিবের পর হাজী সাহেব তাঁর একজন মুরীদ ও মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন কান্ধলুবী সাহেব তিনজন বের হন। শহর থেকে কিছু দূর আসার পর হাজী সাহেব ঘাসের ওপর বসে পড়েন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর মাথা উঠিয়ে বলেন ঃ "মৌলভী রশীদ আহমদকে কেউ ফাঁসি দিতে পারে না। এখনো অনেক কাজ রয়ে গেছে, যা আল্লাহ তার হাত দিয়ে সম্পন্ন করবেন।"

স্বাধীনতা সংগ্রামে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

হিমালয়ান উপমহাদেশের ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ইংরেজকে হতচকিত করে দেয়। ইংরেজ অন্তত এতটুকুন আন্দাজ করতে পারে যে, মুসলমানরা পরাধীনতার জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নাম দিয়েছিল ইংরেজ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। অথচ এটা দেশ ব্যাপী একটা ব্যাপক আন্দোলন ছিল। জালেম ইংরেজ শাসকের পান্‌জা থেকে কোটি কোটি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করার জন্য মুসলমানরা অস্ত্র হাতে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাজার হাজার মুসলমান শাহাদত বরণ করে। প্রায় তেরো হাজার আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। শিশু-বৃদ্ধ কাউকে জালেম ইংরেজ ক্ষমা করেনি। আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় পতাকাধারী ইংরেজ শত শত মুসলিম নারীর সতীত্ব হরণ করতে একটুও লজ্জা অনুভব করেনি। শরীফ ও উচ্চ পরিবারের মেয়েরা জালেম ইংরেজদের হাত থেকে নিজেদের সতীত্ব বাঁচাবার জন্য ঘরের মধ্যে তৈরি কূয়ায় ঝাঁপ দেয়। আর যারা এভাবে মরতে পারেনি তারা নিজেদের মাহরামদের কাছে আবেদন জানায়, ইংরেজদের হাতে বেইজ্জত হবার আগে আমাদের হত্যা করে যাও। এডওয়ার্ড টমাস দিল্লী শহরের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "একমাত্র দিল্লী শহরে পাঁচশো শ্রেষ্ঠ আলেমকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল। জল্লাদদের বাধ্য করা হতো যাতে তারা বেশি সময় লাশ শূলের ওপর টাঙ্গিয়ে রাখে। এভাবে ইংরেজরা বেশীক্ষণ পর্যন্ত তড়পানোর তামাসা দেখতে পারতো। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো ছাড়াও মজলুম ও নিরপরাধ মুসলমানদের গায়ে মোটা মোটা তামার রড পুড়িয়ে দাগ দেয়া হতো। মজলুমদের চিৎকার ডুবে যেতো ইংরেজ দর্শকদের আকাশ ফাটা অট্টহাসির মধ্যে।"

সে সময় মুসলমানদের ওপর ইংরেজদের জুলুমের চাক্ষষ বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈক ইউরোপীয় লেখক বলেছেন ঃ "পুড়িয়ে মারা দুর্ভাগা কয়েদীদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়ে বহুদূর পর্যন্ত চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব এলাকা দিয়ে হাঁটাচলা করাও কঠিন ছিল।" মোটকথা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই তাদের ধরে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। কোনো ফরিয়াদ, আবেদন-নিবেদনে কান দেয়া হয়নি। গোয়েন্দাদের ছিল পোয়াবারো। যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে এনে তারা বলতো, এ ব্যক্তিও বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। ইংরেজ শাসক তখনই সেখানে সামরিক আদালত বসিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোকদ্দমার ফায়সালা শুনিয়ে দিতো এবং অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো অথবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার হুকুম দিতো।

শামলীর জিহাদে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী (র), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র) ও হযরত হাফেয মুহাম্মদ যামেন সরাসরি শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাফেয যামেন সাহেব শাহাদত বরণ করেছিলেন। পরে ইংরেজ সৈন্যরা শামলী ও থানাভুন ধ্বংস করে দিয়েছিল। এর বহুদিন পর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এরই ধ্বংসের তারিখ বের করেছিলেন 'খারাবিয়ে থানা' শব্দগুলোর মাধ্যমে। আরবী আবজাদ-এর হিসাবে এই خرابی تھانہ এর সংখ্যা হয় ১২৭৪ হিজরী। আর এটিই হচ্ছে ১৮৫৭ সাল।

মাওলানা গাংগুহী মুক্তিলাভ করেছিলেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে হারামাইন শরীফে হিজরাত করেছিলেন। মাওলানা নানুতবীর সন্ধানে পুলিশ ও ইংরেজ সৈন্যরা দেওবন্দ ও আশেপাশের এলাকাগুলো চষে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরাত দেখুন, মাওলানা কাসেম একবারও তাদের হাতে ধরা পড়লেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর হেফাযতে। আল্লাহ্ সর্বত্রই তাঁকে সাহায্য করছিলেন। তবুও যে কোনো মুহূর্তে মাওলানা কাসেমের গ্রেফতারের সম্ভাবনা ছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ঘোরাফিরা করতে শুরু করছিল। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ মাওলানা কাসেমের নিজের জানের কোনো পরোয়া ছিল না। তিনি নিছক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মনতুষ্টির জন্য ইংরেজদের হাতে ধরা দিচ্ছিলেন না।

১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব অপরাধীর প্রতি অনুগ্রহ না করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাদের তালিকায় মাওলানা কাসেমের নাম ছিল ১৮৬০ সাল পর্যন্ত। তাই মাওলানা হজ্বে যাবার নিয়ত করে ফেললেন। তিনি নৌকায় চড়ে পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধুতে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে করাচী পৌঁছে জাহাজে সওয়ার হয়ে গেলেন।

১৮৬০ সালে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম হজ্বে রওয়ানা হন এবং ১৮৬১ সালে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন। অর্থাৎ এভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি অনবরত জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক পট পরিবর্তন হয়। ইংরেজের প্রতিশোধ স্পৃহাও দিনের পর দিন কমে আসছিল। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও অনেকের নাম তাদের অপরাধীদের খাতায় লিখিত ছিল। ধীরে ধীরে খাতার পাতা থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা হচ্ছিল।

এভাবে হজ্বের পর মাওলানা কাসেমের জন্যও আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি এখন নতুন সফর শুরু করার প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন।

কিন্তু প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদদের কাহিনী এখানেই শেষ নয়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল আসলে একটি দীর্ঘকালীন আজাদী সংগ্রামের সূচনা মাত্র। এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) ও শাহ ইসমাঈল শহীদের (র) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জিহাদের অবসানের পর থেকে। ১৮৩১ সালে বালাকোটে হযরত সাইয়েদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের শাহাদত বরণের পর আপাতদৃষ্টিতে এ জিহাদের অবসান ঘটে। কিন্তু উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তখনো আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল। সময় সুযোগ পেয়ে তা আবার শত শিখায় জ্বলে ওঠে। আর এ অগ্নিশিখা ইংরেজ রাজত্বকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার জন্য দাবানলের মতো চারদিক থেকে এগিয়ে আসে। উলামায়ে কেরাম এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জিহাদ আন্দোলনের জের চললো

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তার সাথিগণ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দুস্থানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে জিহাদ আন্দোলন পরিচালনা করেন ১৮৩১ সালে বালাকোটে তাঁদের শাহাদত বরণের মধ্য দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে তার পরিসমাপ্তি ঘটলেও ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদী সংগ্রাম ছিল আসলে ঐ মহান আন্দোলনেরই একটি অধ্যায়। এ মহান আন্দোলনের সূচনা হয় হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির চিন্তাধারার মাধ্যমে। তাঁর সমগ্র খান্দান এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর চারজন সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয (র), শাহ আবদুল কাদের (র), শাহ রফীউদ্দীন (র) ও শাহ আবদুল গনি (র) ছিলেন এ আন্দোলনের প্রথম সারিতে। বিশেষ করে শাহ আবদুল আযীযের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। এটি ছিল আসলে উপমহাদেশের মুসলিম উম্মার জন্য কঠিন পরীক্ষার যুগ। মোগল সালতানাতের সূর্য তখন অস্তমিত প্রায়। যে মোগলের নামে এক সময় সারা হিন্দুস্তান কেঁপে উঠতো, তার সে বীর্যবত্তা, সামরিক প্রতিভা কেবলমাত্র কিংবদন্তিতেই খুঁজে পাওয়া যেতো। সামাজিক, নৈতিক ও অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ সুযোগে মারাঠা ও শিখেরা সমগ্র দেশে ফিতনা সৃষ্টি করে চলছিল। এ ফিতনার রূপ ধীরে ধীরে বিশাল হতে বিশালতর হচ্ছিল। ইংরেজ এ উপমহাদেশে ক্রমাগত জেঁকে বসার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর অর্ধ শতক পার হতে না হতেই তারা দিল্লী পর্যন্ত চলে এসেছিল।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য যে আন্দোলনের সূচনা হয় শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার নেতৃত্ব তুলে দিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে। আর শাহ সাহেবের আপন ভাতিজা হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) ও তাঁর সাথিরা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে এ মহান আন্দোলনের চারা গাছটিকে সজীব করে তুললেন। আসলে এটা ছিল একটা পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। সাধারণ গণমানুষের মধ্যে এ আন্দোলন শাখা বিস্তার করেছিল। ইসলাম বিরোধী জুলুম শাসনের যাঁতাকল থেকে জনগণকে রক্ষা করে প্রকৃত ইসলামী শাসনের শান্তি, নিরাপত্তা ও ইনসাফের সাগরে তাদের অবগাহন করানোই ছিল এর লক্ষ। সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ তাঁদের ছয়শো সাথি

সহকারে ১৮৩১ সালের ৬ মে তারিখে বালাকোটের ময়দানে শাহাদত বরণ করলেও এ আন্দোলন থেমে যায়নি। এ আন্দোলন সমগ্র উপমহাদেশ-ব্যাপী মজলুমদের মনে উদ্দীপনার এমন একটি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যা কখনো ধিকি ধিকি আবার কখনো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছিল।

মুসলমান, শিখ ও মারাঠাদের পরাজিত করে ইংরেজ তখন উপমহাদেশে একচ্ছত্র প্রভুত্বের আসনে বসতে সক্ষম হয়েছিল। শিখ ও মারাঠাদের সাথে তাদের এক ধরনের আপোশ হয়ে গিয়েছিল। আর বর্ণহিন্দুরা তো তাদের সহযোগী ও পার্শ্বচরের দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের সাথে কোনো প্রকার আপোশ করতে প্রস্তুত হয়নি। ফলে শিখদের পরে ইংরেজরা মুসলমানদের নতুন দুশমন হয়ে দেখা দিল। তাদের সবচেয়ে মারাত্মক দুশমন হিসেবে। শরীয়তের পাবন্দ প্রত্যেকটি মুসলমানদের ওপরই ইংরেজরা 'ওহাবী' হবার ইলযাম লাগালো। এভাবে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে ভারত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপপুঞ্জে পাঠাতে লাগলো অথবা মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে থাকলো। মুজাহিদদের কেন্দ্র 'সিথানা' ও 'পান্‌জতার'-এর ওপর ইংরেজ সৈন্যরা বারবার আক্রমণ চালিয়েছে। কামানের গোলা নিক্ষেপ করে এ এলাকা দুটো ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এমন সব জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে যে, তা শুনে অতি বড় পাষাণের হৃদয় কেঁপে উঠবে। কিন্তু এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে এমন একটি দুর্বার আকর্ষণ ছিল এবং এর নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটি চুম্বকশক্তি ছিল যার ফলে তাদের একটিমাত্র আওয়াজে দেশের দূরদূরান্ত থেকে দুর্গম পাহাড়, মরুভূমি, বিপদসংকুল দীর্ঘ বনভূমি পার হয়ে হাজার হাজার মাইলের মধ্যে অসংখ্য ইংরেজ সেনাদলের চোখে ধূলো দিয়ে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুসহ কষ্ট বরদাশত করে, ভয়াবহ বিপদের পাহাড় অতিক্রম করে, মাথায় কাফন বেঁধে অসংখ্য মুজাহিদের কাফেলা দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে এই কেন্দ্রগুলোর দিকে এগিয়ে এসেছে।

স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের নেস্তনাবুদ করার জন্য ইংরেজ শাসকরা এমন সব ঘৃণিত ও অমানুষিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যার কথা চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে। সাইয়েদ আহমদ শহীদের (র) ইন্তিকালের পর মুজাহিদদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তারা সিথানায় চলে গিয়েছিলেন। সিথানা সিন্ধু নদের ডান তীরে ইউসুফ জাই উপত্যকা ও ইংরেজ অধিকৃত বৃটিশ টূপির মধ্যবর্তী মহাপন পাহাড়ের ছায়াতলে অবস্থিত একটি নীরব এলাকার নাম। এ এলাকাটি ইংরেজ রাজত্বের বাইরে উসমান জাই গোত্রের কর্তৃত্বাধীন একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এর মধ্যে বেশ কিছু লোকালয় ছিল। তবে তার মধ্যে

সিথানার উচ্চ ও নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত পল্লীটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল থেকে এ এলাকাটি সাইয়েদ যামেন শাহের কবজায় ছিল। যামেন শাহ ছিলেন একজন সংসার ত্যাগী আল্লাহ ওয়ালা বুযর্গ। কোনো এক বিবাদের কারণে তাঁকে নিজের এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তাই দুই দৌহিত্র উমর শাহ ও আকবর শাহ শুরু থেকে সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আকবর ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদের কোষাধ্যক্ষ। সাইয়েদ আহমদের শাহাদতের পর তিনি মুজাহিদদের সিথানায় নিয়ে আসেন এবং সেখানেই তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

মুজাহিদদের সাথে ইংরেজের প্রথম সংঘর্ষ

হাযারা পাঞ্জাবের একটি বড় জেলা। এখানে ছিল শিখদের রাজত্ব। শিখরা মুসলমানদের ওপর ভীষণ জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছিল। শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদ বাহিনী আকবর শাহের নেতৃত্বে সিথানা থেকে অগ্রসর হলো। কিন্তু ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে হাযারা এলাকা ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেলে আকবর শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে সোয়াত এলাকায় ফিরে গেলেন এবং সেখানে সরদার নির্বাচিত হলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সময় উমর শাহ সিথানায় মুজাহিদদের নেতৃত্ব দান করছিলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র এলাকার সরদার। ইংরেজরা সিথানায় মুজাহিদদের স্থান না দেবার জন্য তাঁর কাছে পয়গাম পাঠালো। মুজাহিদদের সিথানায় অবস্থানের সুযোগ দিলে সিথানাকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করা হবে বলে ইংরেজরা হুমকি দিল। ইংরেজদের এ পয়গাম উমর শাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এবার পেশোয়ারের ইংরেজ কমিশনার নতুন চাল চাললো। উসমান জাই গোত্রকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বলা হলো, তোমরা সিথানা আক্রমণ করো, ইংরেজ সৈন্যও তোমাদের সাহায্য করবে। সিথানা দখল করতে পারলে তোমাদের এ পূর্ব এলাকাটি আবার তোমাদের হাতেই ফেরত দেয়া হবে। ইংরেজদের এ চালে কাজ হলো। ১৮৫৮ সালের ৩ এপ্রিল উসমান জাই গোত্র সিথানা আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধে উমর শাহ শাহাদত লাভ করলেন। মুজাহিদরা প্রাণপণ লড়াই করলো। ইংরেজ অফিসার মিউল তার ডাইরীতে লিখেছেন ঃ হিন্দুস্তানী লড়াইয়ের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে তাদের ধর্মীয় আবেগ ও উদ্দীপনা। তারা এমন নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে আসতো এবং এমন দুসাহসিকতার সাথে লড়াই করতো যে, তাদের সাহস ও হিম্মত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহবা দিতে মন চাইতো। তারা নিরবে নির্ভীক চিত্তে কোনো রকম শ্লোগান না দিয়ে হৈ চৈ না করে এগিয়ে আসছিল। তারা নিজেদের সর্বোত্তম পোশাকে সজ্জিত ছিল। তাদের অধিকাংশই সাদা পোশাকে সজ্জিত ছিল। তারা সুযোগ পেলেই জোরেশোরে হামলা চালাতো। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করতো। মনে হচ্ছিল তারা যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে ও পালাতে জানে না। তাদের যুদ্ধ হতো সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত। তারা হয় গাজী হয়ে ফিরে যেতো আর নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হতো।

সিথানার এ যুদ্ধে অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। ইংরেজদেরও বহু সৈন্য হতাহত হয়েছিল। বিজয় লাভের পর ইংরেজ সৈন্যরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে

সিথানা ধ্বংস করে। তারা সেখানকার সমস্ত ঘর ধূলিস্মাত করে। সেগুলো ভাঙার জন্য হাতি ব্যবহার করে। সমস্ত মজবুত পাঁচিল ও দুর্গগুলো বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, গাছগুলো কেটে কেটে ফেলে দেয়া হয়। আর বেশি বড় হবার কারণে যেগুলো কাটা যায়নি সেগুলোর ছাল উঠিয়ে ফেলে, যেন ভবিষ্যতে সেগুলো না বাড়তে পারে। অন্য গোত্রের লোকদের এ শর্তে নিরাপত্তা দান করা হয় যে, তাঁরা মুজাহিদদের আর সেখানে ফিরতে, একত্রিত ও সংগঠিত হতে দেবে না।

কিন্তু মুজাহিদদের হিম্মত এখনো অটুট ছিল। তারা একদিকে সীমান্তে ইংরেজদের দম বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করলো এবং অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নতুন জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করতে লাগলো। এ মহান সংস্কার আন্দোলন ও সংগঠনের কেন্দ্র পাটনার আযীমাবাদে স্থানান্তরিত হলো। আযীমাবাদ শহরের সাদেকপুর মহল্লায় ছিল এ মূল কেন্দ্র।

বাঙালী মুসলমানদের জিহাদী জোশ

হযরত সাইয়েদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দুজন প্রধান খলীফা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরী ও মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীকে দক্ষিণ ভারতে ইসলাহ ও তাবলীগের কাজে পাঠিয়েছিলেন। মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে এবং মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী রামপুরী ছিলেন মাদ্রাজে। এ সময় বালাকোটের জিহাদ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে মাওলানা বেলায়েত আলী ফিরে এসে হতাবশিষ্ট ও চতুরদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজের সাংগঠনিক যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতি অল্প কালের মধ্যে মুজাহিদদের হতাশ ও ভগ্ন বুকে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। লোকদের থেকে নতুন করে জিহাদের জন্য বাইআত গ্রহণ করেন। বাইতুলমাল কায়েম করেন। সারা দেশের কেন্দ্রীয় মসজিদগুলোতে বক্তা ও খতীব নিযুক্ত করেন। সুদূর বাংলায় এবং অন্যান্য প্রদেশে মুবাল্লিগ পাঠান। থানা শহর ও গ্রামগুলোয় মুসলিম জনগণের শিক্ষা ও সংশোধন কাজ পরিচালনার জন্য উলামা নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন মেলায় ও সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। তিনি নিজে বিভিন্ন শহর গ্রাম সফর করেন। অনেক সময় নিজের বাইরের দায়িত্ব সেরে কেন্দ্রে পৌঁছুতে তাঁর কয়েক মাস লাগতো। যেখানে যেতেন সেখানেই লোকদেরকে কাফেরদের ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতেন। কুরআন ও হাদীসের দরস, তাযকিয়ায়ে নফস ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়াই ছিল তাঁর প্রধানতম কাজ। তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল বিহারের আযীমাবাদ শহর। কিন্তু সমগ্র কর্মকালে তিনি সীমান্তের মূল কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন। দুবার তিনি নিজে সীমান্তের কেন্দ্রে উপস্থিত এবং ১২৬৯ হিজরীতে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা বেলায়েত আলীর ইন্তিকালের পর তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এগিয়ে আসেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও মাওলানা ইনায়েতুল্লাহ। তাঁরা এমন নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে জিহাদ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান যার ফলে এ আন্দোলনের ও ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু উইলিয়াম হান্টারকেও এর স্বীকৃতি দিতে হয়। হান্টার তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস'–এ লেখেন ঃ

"এরা মিশনারীদের মতো অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আন্তরিকতা ও নিস্বার্থপরতার সাথে কাজ করে যায়। এদের জীবন যাপন পদ্ধতি সব রকম সন্দেহের উর্ধে। নিজেদের কেন্দ্রে অর্থ ও লোক সরবরাহ করার যোগ্যতা এদের অপরিসীম। আপতদৃষ্টিতে মনে হবে এদের কাজ নিজেদের স্বধর্মীয়দের আত্মশুদ্ধি কিন্তু আসলে এরা মুসলমানদের মধ্যে সেই জিহাদী জযবাকে পুনরুজ্জীবিত করছে ক্রুশেড যুদ্ধের সময় যা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। সম্মান ও মর্যাদা সহকারে তাদের কথা আলোচনা না করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। তাদের প্রত্যেকেই একজন শক্ত-সমর্থ ও কর্মঠ যুবকের মত কাজ করে ; তাদের জোশ ও জযবা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত সংযোগ বিস্ময়কর মনে হয়। মৃত্যুকে তারা সবসময় বরণ করে নিতে প্রস্তুত। আজকাল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মৌলভী ইয়াহ্ইয়া আলী নামক এক ব্যক্তি। ইনি একজন অদ্ভূত ও রহস্যময় পুরুষ। এ ব্যক্তি নিজের দলের সাংগঠনিক কাঠামো এমনভাবে কায়েম করেছেন যেন মনে হয় তিনি একটি রাষ্ট্র চালাচ্ছেন এবং এ রাষ্ট্রের সমস্ত মেশিন ও কলকজা নিজের নিজের জায়গায় ঠিক ঠিকভাবে চলছে। এ ব্যক্তি একটা বিশেষ গোপন সাংকেতিক ভাষা আবিস্কার করেছেন। তার দলের লোকেরা গোপন খবরা-খবর আদান-প্রদানের সময় এ ভাষা ব্যবহার করে। তিনি এমন সব উপায় উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছেন যেগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা সীমান্ত পারের বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে (অর্থাৎ সিথানায়) পাঠানো হয়। তিনি মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করে ধর্মীয় দেওয়ানাদের সেনাদলের জন্য বন্দুক সংগ্রহ করেন। তাঁর সবচেয়ে নাজুক কাজ হচ্ছে পাটনার ছোট কেন্দ্র থেকে সীমান্ত পারের বড় কেন্দ্রের জন্য লড়াকু মুজাহিদ বাহিনী পাঠানো। বাঙ্গালী মুসলমানদের সেখানে পাঠানো হচ্ছে। এ বাঙ্গালী মুসলমানরা সীমান্তে গিয়ে ইংরেজদের সাথে লড়াই করার খায়েশ রাখে। এদের পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তৃত এলাকা পার হবার জন্য প্রায় দুহাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। এদের দৈহিক কাঠামো, আকৃতি ও ভাষা পথিমধ্যের প্রত্যেকটি গ্রামে এদেরকে আগন্তুক প্রমাণ করে। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া আলীর অপার বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক যোগ্যতাই এক্ষেত্রে সব সহজ করে দিয়েছে। এ ব্যক্তি এ দীর্ঘ পথের বিভিন্ন স্থানে নিজের লোক মোতায়েন করে রেখেছেন, যাদের উপর পুরোপুরি ভরসা করা যেতে পারে, ইয়াহ্ইয়া আলীর মানুষ চেনার ও কর্মী নির্বাচনের অপার যোগ্যতার কারণে এমন সব লোক এই সমস্ত পথে নিযুক্ত হয়েছে যাদের একজনকেও গ্রেফতারের ভয়, সনাক্ত হয়ে যাবার আশংকা এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সম্ভব নয়।"

মুজাহিদ দলের ব্যাপ্তি ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে বাংলার ইংরেজ পুলিশ কমিশনার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ

"এ দলের এক একজন মুবাল্লিগের অনুসারী হচ্ছে আশি হাজার মুসলমান। এদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আসলে পূর্ব বাংলার প্রত্যেক জিলা বিদ্রোহের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পাটনা থেকে নিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত গংগার সমগ্র প্রবাহ পথের দুপারে বসবাসকারী মুসলমান কৃষকরা বিদ্রোহীদের কেন্দ্রের জন্য সাপ্তাহিক সাহায্য পাঠাচ্ছিল। বাঙ্গালীদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারা দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির হয় কিন্তু আমি দেখছি, জিহাদী জোশের ক্ষেত্রে এ দুর্বল ও ভীরু বাঙ্গালী মুসলমান সীমান্তের আফগানীদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।"

হযরত সাইয়েদ আমহদ শহীদের আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলন ছিল, এতে সন্দেহ নেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দিকে এর আক্রমণ ছিল শিখদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী সম্পর্কে দলের বিশেষ পর্যায়ের নেতৃবর্গ পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। তাছাড়া একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, যাদের ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধ একটি প্রত্যন্ত প্রদেশে শিখদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বরদাশত করতে পারেনি তারা কেমন করে সারা দেশে বিদেশাগত একটি কাফের জাতির কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবে ?

তিনজন মুজাহিদ নেতার গ্রেফতারী

কাজেই ইংরেজরা যখন পাঞ্জাব জয় করলো তখন তারা হয়ে পড়লো মুজাহিদদের আক্রমণের লক্ষবস্তু। এ দলের প্রচারণার বিষয়বস্তু ছিল ঃ গায়ের ইসলামী কর্তৃত্বের আওতায় মুসলমানদের জীবন যাপন করার কোনো শরয়ী অনুমতি নেই। কোথাও অমুসলিমদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেখানে মুসলমানদের জিহাদ করা অথবা হিজরত করা ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পথই খোলা থাকে না। এ কারণে এ দলের নেতৃবর্গ প্রকাশ্যে তদানিন্তন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন। ১৮৫৭-এর জিহাদের পূর্ববর্তী সময় মুজাহিদীন নেতা মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলীকে বাংলার রাজশাহী জেলায় জনগণকে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। ইংরেজ সরকার তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাদের কাছ থেকে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার গ্যারাণ্টি নেবার পরও দুবার করে তাদের এ জেলা থেকে বহিষ্কার করেন। এ সময় পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট করেন ঃ "বিদ্রোহী দল ও জনগণের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক চিন্তাধারা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। এমনকি পুলিশও তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। এদেরই এক সরদার মৌলভী আহমদুল্লাহ নিজের গৃহে জনতার এক সমাবেশে ঘোষণা করেছেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আর কোনো তল্লাশী অভিযান চালানো হলে তারা যথারীতি অস্ত্রের সাহায্যে তার মোকাবিলা করবে।"

পাটনার ডিভিশনাল কমিশনার উইলিয়াম টেলর এ মুজাহিদ দলকে বাঘের মতো ভয় করতেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ "এ দলের লোকেরা তাদের সরদার বা পীরকে পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চলতো, এজন্য তারা প্রয়োজনে জান দিতেও কুণ্ঠিত হতো না। এদের আমীর এক লাইন না লিখেও কোনো গোপন পয়গাম অবিশ্বাস্য কম সময়ে পাটনা থেকে লাহোরে বা পেশোয়ারে পৌঁছাতে পারতেন এবং যেমনি চান তেমনিভাবে তাঁর হুকুম তামিল করাতে পারতেন।" কাজেই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে টেলর সাহেব মুজাহিদ দলের নেতৃস্থানীয়দের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু মুজাহিদ নেতাদের গ্রেফতার করা চাট্টিখানি কথা ছিল না। তাহলে শুধু পাটনা শহরেই নয়, সারা হিন্দুস্তানে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই কমিশনার টেলর একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি পাটনা শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নামে হাতে হাতে একটা চিঠি পাঠালেন এ মর্মে যে, শহরের কোনো কোনো স্থানে

দাংগা হাংগামা হবার আলামত দেখা যাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আপনি কমিশনার সাহেবের কুঠিতে হাযির থাকবেন।

পরের দিন কমিশনার টেলরের বাসায় শহরের যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি হাযির হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মুজাহিদ দলের তিনজন নেতাও ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ মৌলভী আহমদুল্লাহ, মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন ও মৌলভী ওয়ায়েজুল হক। কমিশনারের পক্ষ থেকে সবার জন্য খাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে কমিশনার উইলিয়াম টেলর ক্যাপ্টেন রোটরে ও সুবেদার হেদায়েত আলী অন্য কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাথে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ শুরু হয়ে গেলো। আলাপের মাঝখানে টেলর মুজাহিদ নেতাদের দিকে বার বার চাইতে লাগলেন এবং পেরেশানীর সাথে এপাশ ওপাশ করতে থাকলেন। কিন্তু তাঁরা তিনজন নির্ভয়ে বসে রইলেন। আলোচনা ও খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর মেহমানরা চলে যাবার অনুমতি চাইলে টেলর সবাইকে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁরা তিনজন নিজেদের জায়গায় বসে রইলেন। এ অবস্থা দেখে টেলর অবাক হলেন। তিনি বলেই ফেললেন ঃ আপনরাও চলে যেতে পারেন। একথা শুনে মৌলভী আহমদুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন ঃ কি ব্যাপার ! আপনি আমাদের গ্রেফতার করার সংকল্প করেছেন আবার নিজেই বলছেন চলে যাও ?" একথা শুনে টেলরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ভাবলেন, বোধ হয় এদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। মৌলভী আহমদুল্লাহ তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন ঃ "ভয় করবেন না। আমরা নিরস্ত্র। আপনি নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রেফতার করতে পারেন। আমরা বাধা দেবো না।"

টেলর সাহেব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি মুখ রক্ষার খাতিরে বললেন ঃ "দেখেন আমার কাছে আপনাদের অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নেই। তবুও আপনাদের গ্রেফতারীকে আমি জরুরী সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মনে করি।"

একথা বলে তিনি সুবেদার হেদায়েত আলীকে ইশারা করে বাইরে চলে গেলেন এবং একজন শিখ সৈন্যকে সাথে নিয়ে ভেতরে এলেন। আসলে তাদের গ্রেফতার করার জন্য টেলর সাহেব পূর্বাহ্নেই একটি পূর্ণ শিখ রেজিমেন্ট ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মৌলভী আহমদুল্লাহ এ সময় হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন ঃ "আমাদের মতো তিনজন নিরস্ত্রকে গ্রেফতার করার জন্য এতবড় সেনাদলের প্রয়োজন ছিল না।" টেলর লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

তিনজন শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ নেতার গ্রেফতারী কোনো মামুলি ব্যাপার ছিল না। সমগ্র শহরে এবং সারা হিন্দুস্তানে যেন আগুন লেগে গেলো। সীমান্তের মুজাহিদ গ্রুপ আশেপাশের গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলো। তারা লেফটেন্যান্ট হর্নের ক্যাম্পে নৈশ আক্রমণ পরিচালনা করলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকা

ফলে ১৮৬৩ সালের ১৮ অক্টোবর চেম্বারলেনের নেতৃত্বে সাত হাজার বৃটিশ সৈন্যের একটি দল সীমান্ত প্রদেশের দিকে রওয়ানা হয়। এলাকায় পৌছে চেম্বারলেন জানতে পারেন, স্থানীয় উপজাতিরা মুজাহিদদের সাথে মিলে গেছে এবং পাঞ্জাব সরকার আরো বেশী সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে। কাজেই ফিরোজপুর, লাহোর ও শিয়ালকোট থেকে আরো সেনা সাহায্য এসে পড়লো। ১৪ নবেম্বর পর্যন্ত অবস্থা আরো নাজুক পর্যায়ে পৌছে গেলো। বৃটিশ সেনাদলের কমাণ্ডার ইন চীফ নিজে লাহোর চলে এলেন এবং নিজে সবকিছু পরিচালনা করতে লাগলেন। পাঞ্জাব সরকার ১৫ শত সৈন্যের একটি এডিশনাল ব্রিগেড পাঠাবার আবেদন জানালো। জেনারেল চেম্বারলেনের টেলিগ্রাম আবার নতুন করে চারদিকে ভীতি ছড়িয়ে দিল। ১৮ নভেম্বর মুজাহিদরা একটি প্রচণ্ড আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করলে ইংরেজ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলো। তাদের ১১৪জন সৈন্য মারা পড়লো। মুজাহিদ বাহিনী পুনর্বার আক্রমণ চালালো এ আক্রমণটা প্রথমবারের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী ও সংগঠিত ছিল। জেনারেল চেম্বারলেন ভীষণভাবে আহত হলেন। এবার কয়েকজন অফিসার ছাড়াও ১২৮জন ইংরেজ সৈন্য নিহত হলো। ২০ নভেম্বর ৪২৫জন আহত সৈন্যকে পেছনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এ যুদ্ধে মোট ৮৪৭জন ইংরেজ সৈন্য হতাহত হলো। ফলে ইংরেজ সরকার নিজের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে সেই একই নাটকের পুনরাবৃত্তি হলো, যা পূর্ব থেকেই মুসলমানদের মধ্যে হয়ে আসছে। প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য লাভে ব্যর্থ ইংরেজ এবার ষড়যন্ত্রের জাল বিছালো। স্থানীয় উপজাতিদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে ফেললো এবং মুজাহিদ বাহিনীকে সহায়তা করা থেকে তাদের বিরত রাখলো। মুজাহিদরা এবার নিসংগ হয়ে পড়লো। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার সগর্বে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমাদের অস্ত্র যে কাজ করতে পারলো না, আমাদের ডিপ্লোমেসী তা করে ফেললো। তবুও এ অভিজ্ঞতটা আমাদের বহুমূল্য লব্ধ।"

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহে ইংরেজ একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। তারপর মুজাহিদদের এই একের পর এক প্রচণ্ড আক্রমণে তারা দিশেহারা ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলে। নিজেদের তৈরী করা আইন কানুন তারা নিজেদের দুপায়ে দলতে লাগলো। এবার তারা প্রতিশোধ গ্রহণে দেওয়ানা হয়ে পড়লো

এবং সীমান্তের মুজাহিদদের সাথে সম্পর্ক রাখে বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দেশের এমন সমস্ত মুসলিম আমীর ও প্রভাবশালী লোকদের গ্রেফতার করতে ও তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগলো। ইতিপূর্বে তারা মৌলভী আহমদুল্লাহ, মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন ও মৌলভী ওয়ায়েজুল হককে গ্রেফতার করেছিল। এবার ১৮৬৪ সালে আরো ৮জন দেশ বরেণ্য মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করলো। থানেশ্বরের রইস মৌলভী মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, মৌলভী ইয়াহ্ইয়া আলী আযীমাবাদী, মৌলভী আবদুর রহিম আযীমাবাদী, লাহোরের রইস মুহাম্মদ শফী সওদাগর ও তাঁর কতিপয় কর্মচারী কাযী মিয়াজান প্রমুখগণ তাদের অন্যতম। এদের সবার নামে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করা হলো এবং সবার ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে দেয়া হলো। পরবর্তী পর্যায়ে একটি অদ্ভুত রকমের আইনগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের প্রাণদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হলো এবং সবাইকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

এ সমগ্র সময়ে পাটনার জিহাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এমনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সবর, দৃঢ়তা, অবিচল নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন, যা উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর পথের এ সৈনিকগণ নিজেদের পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারা জীবন যাপন এবং তারপর দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আন্দামানের অবরোধ জীবনের দিনগুলোয় একটুও হিম্মতহারা হননি। তাদের নিষ্ঠা ও সংকল্পে একটুও পরিবর্তন আসেনি। সেখানেই তারা একজন অন্যজনের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারতেন না। এমনকি মৃত্যুর পরও ইয়াহ্ইয়া আলীর কবরটি মৌলভী আহমদুল্লাহর কবরের পাশে দেয়ার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

কারাগারে মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলীর দৃঢ়তা

মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলী পাটনায় উপমহাদেশের মুজাহিদ জামায়াতের আমীর ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন সুযোগ্য শাগরিদ। উস্তাদের রঙে তিনি নিজেকে পুরোপুরি রঞ্জিত করেছিলেন। উস্তাদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। মাওলানা আবদুর রহীম সাদেকপুরী তাঁর 'দুররি মনসুর' গ্রন্থে মাওলনা ইয়াহ্‌ইয়া আলীর কারাজীবনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা থেকে একদিকে যেমন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ফুটে ওঠে তেমনি অন্যদিকে মুজাহিদ জামায়াতের সদস্যবৃন্দের চরিত্র ও মানসিক উন্নতির আভাসও পাওয়া যায়।

"ফাঁসির হুকুম শুনাবার পর মাওলানাকে আম্বালা জেলে আটক করা হয়। তখন মাওলানার ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখার মতো ছিল। আমিও ছিলাম তাঁর সাথে। ঘটনাক্রমে আমাদের দুজনের ভাগ্যে পড়েছিল একটি সংকীর্ণ আঁধার কুঠরী। মাওলানা ইয়াহ্‌ইয়া শেষ রাতে জেগে উঠতেন। এ সময় তিনি যথারীতি নামায ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় শাহ নিয়ায বেরেলবী ও হাফিয শিরাজীর কবিতা আবৃত্তি করতেন। এ সময় তিনি গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। আমরা ম্রিয়মান হয়ে থাকতাম কিন্তু মাওলানা থাকতেন সবসময় হাসিখুশি ও খোশ মেজাজে। তাঁর চেহারায় দুঃখ, শোক ও ক্লান্তির কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেতো না। আল্লাহর স্মরণ ও যিকিরের প্রতি তিনি সর্বক্ষণ আকৃষ্ট থাকতেন। যে কুঠরীতে আমরা থাকতাম অত্যধিক গরম আবহাওয়ার কারণে তার মধ্যে একনাগাড়ে সাতদিনের বেশি থাকা সম্ভবপর ছিল না। এরপর তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হতো। তাই জেলের ডাক্তার কারাগারের দরজা খুলে রাখার হুকুম দেয়। এ উদ্দেশ্যে দরজায় পাহারা দেবার জন্য একজন সিপাহীকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়। কারোর কুঠরীর বাইরে বেরুবার হুকুম ছিল না।

পরে আমাকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। মাওলানা এভাবে দুই আড়াই মাস নির্জন কারাবাসে থাকেন। চূড়ান্ত সবর ও দৃঢ়তার সাথে তিনি এ দিনগুলো অতিবাহিত করেন। কোনো সিপাহী বা পাহারাদার তাঁর সামনে এলে, সে হিন্দু ও মুসলমান যেই হোক না কেন, তিনি তাকে তাওহীদের বাণী শুনাতেন, আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে তাকে বুঝাতেন এবং কবরের আযাবের

প্রকৃতি বর্ণনা করতেন। আখেরাতের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। নির্জন কারাভ্যন্তরে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী এভাবে এক মহিমাময় পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর কুঠরীর পাহারাদার সিপাহীরা হতো গুর্খা বা শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমান সিপাহী কখনো তার পাহারায় মোতায়েন করা হতো না। সেই গুর্খা ও শিখ সিপাহীদেরকে তিনি কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন। এমন মিষ্টি ভাষায় তিনি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনাতেন যে, সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদতো। তাদের পাহারা বদলের সময় তারা মাওলানাকে ছেড়ে যেতে চাইতো না। আমি বলতে পারবো না সে সময় মাওলানার ওয়াজ নসীহতে পাহারাদারদের কত ফায়দা হয়েছিল, কতজন শেরেক ও কুফরী ত্যাগ করে পাক্কা তাওহীদবাদী হয়ে গিয়েছিল এবং কতজন তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ? এর খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। মাওলানা অকৃপণ হাতে সবাইকে অনুগ্রহ বিলাতে থাকেন। তাঁর দান মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয়নি। তাঁর শরীর ছিল ফিরিংগীদের কয়েদখানায় কিন্তু হৃদয় ও মুখ ছিল মুক্ত আযাদ। তাদের ওপর কারোর শাসন ছিল না। সেখানে ছিল একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব। দু মিনিটের জন্যও কেউ তাঁর সামনে এলে তিনি তাকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতেন ও অসৎ-অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন।

পরে ফাঁসির হুকুম বাতিল করে আমাদের অন্য কয়েদীদের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়। যেসব কয়েদীকে আন্দামানে পাঠানো হয় নিয়ম অনুযায়ী তাদের দাড়ি চেঁছে দেয়া হয়। কাজেই আমাদের মতো মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীরও দাড়ি চেঁছে ফেলা হয়। কোমর পর্যন্ত লম্বা গেরুয়া রংয়ের একটি জামা পরিয়ে দেয়া হয়। সবাইকে কান পর্যন্ত ঢাকা গেরুয়া রংয়ের টুপি পরিয়ে দেয়া হয়। এ যোগীদের পোশাক আইনগতভাবে এই জেলে সব বন্দীকে দেয়া হয়। এক সকালে ক্যাপ্টেন টাই সাহেব আম্বালার ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কমিশনার সাহেব এবং পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট পারসন সাহেব জেলে আসেন। তারা দারোগাকে হুকুম দেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগাতে। কাজেই দারোগা একটি বড় কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য রেহেট ঘুরাবার কাজে মাওলানাকে লাগিয়ে দেন।[১]

---

১. রেহেট হচ্ছে তিরিশ চল্লিশটা বড় আকারের বালতি দিয়ে কুয়া থেকে পানি তোলার একটি চাক্কি। চাক্কিটা কুয়ার মাথার ওপর দিয়ে লম্বাকৃতির চাকার আকারে বসিয়ে দেয়া হয়। কয়েকটি গরু কলুর ঘানির মতো চারিদিকে পাক দিয়ে কুয়া থেকে পানি তুলতে থাকে। ইংরেজের জেলে এ কাজে মানুষকে ব্যবহার করা হয়।

গনগনে আগুনের মতো দুপুরের রোদের মধ্যে আটজন তাগড়া জোয়ান কয়েদী সেই রেহেটে জোতা ছিল। তারা বড় কষ্টে রেহেট টানছিল। মাওলানাকেও তাদের সাথে জুতে দেয়া হয়। তিনদিন একাধারে মাওলানা রেহেট চালাতে থাকেন। এ অমানুষিক কষ্টের দরুন তাঁর রক্তে প্রেশার আসতে থাকে। কিন্তু তাঁর মুখে কোনো নালিশ বা অভিযোগ শুনা যায়নি। সবর ও শোকরের সাথে তিনি কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে থাকেন।"

আল্লাহর পথের এক মুজাহিদ

মৌলভী আবদুর রহীম সাদেকপুরী তাঁর 'দুররি মনসুর' গ্রন্থে মুজাহিদ আন্দোলনের নেতা মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর কারা-জীবনের ঘটনা প্রসঙ্গে লাহোর জেলের কাহিনী লিখেছেন। আম্বালা জেল থেকে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীকে লাহোর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তিনি এক বছর থাকেন। এখানেও তিনি কয়েদীদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার ও সুদোপদেশ দান করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ কারাগারে চোর, ডাকাত ও বদমাইশদের প্রাচুর্য ছিল। এজন্যে তিনিও নিজের বক্তৃতা ও উপদেশাবলী এসব বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতেন। তাঁর বক্তৃতার ফলে শত শত চোর ও ডাকাত তওবা করে। তারা জীবনে কোনোদিন এসব কাজ না করার অঙ্গীকার করে।

এখানে একজন বেলুচী ডাকাতের কথা বর্ণনা করা যায়। তার নাম ছিল মারযী। চুরি ও ডাকাতির পেশা তার বাপ-দাদার আমল থেকেই চলে আসছিল। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী জওয়ান। কারাগারে এসেও সে তার খাসলাত পরিবর্তন করেনি। কারাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা কিছুই সে মানতো না। সরকার প্রদত্ত শ্রম সে কখনোই করতো না। শত শত ঘা বেত তার পিঠে মারা হয়েছে। সে একবার উহ্ পর্যন্তও বলেনি। নিজের দুষ্কৃতি সে করেই চলছিল। লোহার বেড়ী, ডাণ্ডাবেড়ী, হাত কড়ি, পায়ে ও গলায় লোহার শিকল ঝুলিয়ে দেয়া এবং নিসঙ্গ প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ রাখা—সবকিছু শাস্তি দিয়ে দেখা হয়েছে। কোনোটারই সে পারোয়া করেনি। কোনোটাই তাকে কাবু করতে পারেনি। জেলের দারোগা, জমাদার সবাই তাকে ভয় করতো। সুযোগ পেলেই তাদের ওপরও সে আক্রমণ চালাতো এবং হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় তাদের মেরে বেহুশ করে ফেলতো।

ঘটনাক্রমে এ বেলুচী ডাকাতকে মাওলানার প্রকোষ্ঠে স্থানান্তর করা হয়। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর সাহচর্য তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সে কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে বদলে যায়। তার মন-মানস পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে এমন সদাচরণ করতে থাকে যে দারোগা, জমাদার ইত্যাদি সবাই অবাক হয়ে যায়। হাতকড়া, লোহার শিকল সবকিছু থেকে তাকে মুক্ত করা হয়। তাকে কাপড় তৈরির কারখানায় নিয়োগ করা হয়। ভালো করলে বছরে এক-দুমাস শাস্তি মাফও পাওয়া যায়। তার কারাবাসের মেয়াদও কমতে থাকে। মাওলানা সাদেকপুরী লিখেছেন, তিনি লাহোর কারাগারে গেলে সেখানে এই দুর্দান্ত বেলুচী কয়েদীকে নিজের চোখে দেখেন। তখন সে পাঁচ ওয়াক্ত

জামায়াতের সাথে নামায পড়তো এবং নিজের অতীতের দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতো ! মাওলানা সাদেকপুরী বলেন, তাকে আমি একজন আল্লাহর অলী হিসেবে পেয়েছি। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সম্পর্কে এ ধরনের আরো বহু ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। মোটকথা জেলখানায় তাঁর অস্তিত্ব কয়েদীদের জন্য হেদায়েতের একটি আদর্শ হিসেবেই প্রতিভাত হয়। হাজার হাজার কয়েদী তার উন্নত চরিত্র, জ্ঞান গরিমা ও আদর্শ থেকে লাভবান হয়। জেলের কর্মকর্তারা তার অস্বাভাবিক কার্যক্রম ও প্রভাব দেখে অবাকই হতো। হিন্দু কয়েদীরা তাকে দেবতা ও অবতার মনে করতো এবং মুসলিম কয়েদীরা মনে করতো আল্লাহর অলী।

কিছুদিন পরে আন্দামান পাঠাবার জন্য মাওলানাকে লাহোর থেকে রেলযোগে মুলতান জেলে পাঠানো হয়। সেখানে সপ্তাহ খানেক অবস্থানের পর ষ্টীমার যোগে রোহড়ী, ভক্কর ও শুক্কুর হয়ে কোটরী পৌঁছানো হয়। সেখান থেকে করাচী বন্দরে আনা হয়। করাচীতে এক সপ্তাহ রাখার পর সামুদ্রিক জাহাজ যোগে বোম্বাইতে আনা হয়। বোম্বাই থেকে রেলযোগে থানা নামক একটি স্থানে তাঁকে আনা হয়। থানা শহরে মারাঠাদের নির্মিত একটি দুর্গ ছিল। ইংরেজরা এ দুর্গকে কারাগারে রূপান্তরিত করেছিল। বোম্বাই ও পাঞ্জাবের সবচেয়ে মারাত্মক হিংস্র ও নিষ্ঠুর পর্যায়ের কয়েদীদের এখানে পাঠানো হতো। মাওলানাকেও এখানে রাখা হয়। মাওলানা সর্বত্র নিজের কাজ করে যেতে থাকেন। কয়েক মাস মাওলানাকে এখানে রাখা হয়। তারপর ১৮৬৫ সালে ৮ ডিসেম্বর সামুদ্রিক জাহাজে চড়িয়ে তাকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে রওয়ানা করে দেয়া হয়। এ সফরের কষ্ট ছিল বর্ণনাতীত। যাহোক ১৮৬৬ সালের ১১ জানুয়ারী অন্যান্য কয়েদীদের সাথে তিনি আন্দামানে প্রবেশ করেন। সেখানে চীফ কমিশনারের পক্ষ থেকে মুনশী আকবর জামান সাহেব মাওলানাকে নিজের গৃহে স্থান দেন।

মুনশী আকবর জামান নিজেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। দুশমনরাও তার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাই ইংরেজ শাসক মুনশী সাহেবকে অত্যধিক সম্মান করতেন। কয়েক দিন পর মাওলানা আহমদুল্লাহকেও সেই গৃহে ডেকে আনা হয়। কিছুদিনের মধ্যে দুররি মনসুরের লেখক মাওলানা আবদুর রহীম সাদেকপুরীও সেখানে পৌঁছে যান। এ সময় মাওলানা সাদেকপুরী তিন চার মাস মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর খেদমতে থাকেন। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী দু বছর সেখানে ইবাদাত বন্দেগী ও শিক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর ১৮৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারী পরম প্রিয়তমের সাথে মিলিত হবার জন্য দারে আখেরাতের সফর করেন।

মাওলানা হাসরাত মোহানীর দুঃসাহস

মুসলমানদের আযাদী স্পৃহার পেছনে থাকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। হিমালয়ান উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসানের পর মুসলমানরা এ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে অর্ধ শতক ধরে জিহাদ আন্দোলন চালায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু পর পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলমানরা যে আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করে তা ছিল তাদের প্রাচীন ও পূর্বতন ঐতিহ্য সঞ্জাত। পুরাতন ধারায় তারা এ সংগ্রাম পরিচালনা করে। কিন্তু এরপর বিশ শতকের শুরু থেকে তারা আবার সম্পূর্ণ নতুন ধারায় শুরু করে আযাদী সংগ্রাম।

১৮৬৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর উপমহাদেশের রাজনীতি থেকে বলতে গেলে মুসলমানরা প্রায় আলাদাই ছিল। কথাটা এভাবেও বলা যায়, একের পর এক পরাজয় ও ব্যর্থতা তাদের মন ভেঙ্গে দিয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তারা সম্পূর্ণ রূপে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। এ সময় মাঝে মধ্যে দু একজন মুসলমানের নাম শোনা যেত। যেমন মাদ্রাজের সাইয়েদ মুহাম্মদ। তিনি কংগ্রেসের সহযোগী ছিলেন। অথবা বিচারপতি তৈয়বজির নাম কখনো কখনো শোনা যেত। মাওলানা শিবলী নোমানী চিন্তাধারার দিক থেকে কংগ্রেসী ছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসিক যুবক মাওলানা হাসরাত মোহানী ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি আলীগড়ের ছাত্র হয়েও আলীগড়ের পলিসির বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯০৪ সালের মে মাসে বোম্বাই শহরে ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাওলানা হাসরাত মোহানী এ অধিবেশনে একজন প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় থেকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার চালাতে থাকেন। কিন্তু কংগ্রেসের মোনাফেকী নীতির কারণে তিন বছর পরেই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তবুও নিজস্ব পর্যায়ে তিনি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরোধের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীও এ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে হাসরাত তার উর্দু-ই-মুআল্লাহ পত্রিকায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধটির কারণে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালায়। মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবীর ভাষায় আলীগড়ের নীরব শান্ত পরিবেশে এটা ছিল বিদ্রোহের প্রথম অপরাধ। ফলে কলেজকে বাঁচাবার জন্য কলেজের বড় বড় দায়িত্বশীলরাও হাসরাতের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেন। কিন্তু বিদ্রোহ মামলা চলাকালে হাসরাতের উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রবন্ধ লেখকের নাম

প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং প্রবন্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নেন। হাসরাতের দু বছরের কারাদণ্ড হয় এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাদি সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরী পুলিশ মাত্র ৬০ টাকায় নীলাম করে দেয়।

এ সময় উর্দু-ই-মুআল্লায় আরো দুটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধ দুটিতে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনীতির শিক্ষা দেয়া হয়। এর একটির লেখক ছিলেন দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদের মোল্লা আবদুল কাইউম। তিনি ছিলেন হায়দারাবাদের দায়েরাতুল মা'আরিফের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ভুপালের বিখ্যাত আলেম মৌলভী বরকতুল্লাহ। মৌলভী বরকতুল্লাহ প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগেই হিন্দুস্তান ত্যাগ করে ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি ইউরোপে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আগত ভারতীয় মুসলমান যুবকদেরকে ইংরেজের হাত থেকে উপমহাদেশকে স্বাধীন করার প্রেরণা যোগাতেন ও তাদের সামনে বৈপ্লবিক কর্মসূচী তুলে ধরতেন। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত মৌলভী বরকতুল্লাহ জীবিত ছিলেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করে ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন।

বিশ শতকে মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা

বিশ শতকের শুরুতে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা হাসরাত মোহানীর নাম ছিল নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। হাসরাত যখন রাজনৈতিক ময়দানে পুরোপুরি সক্রিয় তখন হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে শুনা যাচ্ছিল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, গোখলে ও বালগঙ্গাধর তিলকের নাম। গান্ধীজির নাম তো তখনো কেউ জানতো না। তখনো তাঁর কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি, যা তিনি পরবর্তী পর্যায়ে কিছু মুসলিম নেতার বদৌলতে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মুসলিম নেতাদের মধ্যে হাসরাতের নাম উল্লেখ করা যায় সবার আগে।

হাসরাত চিরকালই ছিলেন গরীব। তাঁর এ গরীবি একদিক দিয়ে ছিল তাঁর স্ব-আরোপিত। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যান্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের মতো তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে সহজ আর্থিক সচ্ছলতার পথ বেছে নেননি। সচ্ছল, প্রাচুর্য ও আরামের জীবনের তুলনায় তিনি দারিদ্র ও অভাবের জীবনই বেছে নিয়েছিলেন। সারা জীবন তিনি গজ প্রতি কয়েক আনা মূল্যের কাপড় ছাড়া বেশি দামের কাপড়ই পরেননি। বিলাতি কাপড়ে তো তিনি কোনোদিন হাতও দেননি। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি আলীগড়ে স্বদেশী ষ্টোর নামে স্বদেশী কাপড়ের একটি দোকান খুলে দিলেন। সারা দেশে এ দোকানটির শাখা কায়েম করার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন। মাওলানা শিবলী নোমানী তাঁর সহায়তায় এগিয়ে এলেন। মাওলানা শিবলীর সুপারিশ ক্রমে তিনি স্যার ফাজেল ভাই করিম ভাইর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি হাসরাতকে পরিমাণ মতো অর্থ ঋণ দিলেন। হাসরাতের এ সমস্ত ব্যবসায়ী তৎপরতা দেখে মাওলানা শিবলী একবার লিখলেন ঃ

"তুমি জিন না মানুষ ? প্রথমে ছিলে কবি, হলে রাজনীতিক, আবার এখন বেনিয়া।"

হাসরাত ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লিখালেন ঠিকই কিন্তু বারবার কারা বরণের কারণে তাঁর কাপড়ের ব্যবসায় জমে উঠতে পারলো না। তবে এ সময় মুসলমানদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সংগঠন কায়েম করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। একজন উদ্যমী যুবক ও একজন অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান মুসলিম নেতা এতে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন।

অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান নেতা হলেন, নওয়াব ভিকার-উল-মুল্ক এবং উদ্যমী যুবক হলেন ব্যারিষ্টার মজহারুল হক। মজহারুল হক সাহেব নওয়াব ভিকার-উল-মুলকের সাথে সাক্ষাত করে 'মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দলের কাঠামো তৈরী করেন। মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঢাকার গুরুত্ব এদিক দিয়ে অনন্য যে, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর আহ্বানে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়। এ সময়কার উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাংলার স্থান সবার উপরে। নিসংশয়ে বলা যায়, হিন্দু রাজনীতিবিদরা ২৫ বছরে যে পথ অতিক্রম করেছিলেন মুসলমানরা এ সময় মাত্র ৬ বছরে সে পথ পাড়ি দেয়। পরিস্থিতি মুসলমানদের অল্প সময়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সাহায্য করেছিল।

মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনাকে রাতারাতি জাগিয়ে দিয়েছিল যে ঘটনাটি সেটি হচ্ছে ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বঙ্গভংগ রদ। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ নামে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে দেখা যায় মুসলমানদের একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ফলে বাঙ্গালী মুসলমানরা ধীরে ধীরে হিন্দু রাজনীতির প্রভাব মুক্ত হতে থাকে। এজন্য বাঙ্গালী মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জোর সমর্থন দেয়। তারা সর্বত্র আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করে ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠান করে আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেয়। অরবিন্দ ঘোষের দলতো বোমা নিক্ষেপ করে প্রশাসন যন্ত্রে ভীতির সঞ্চারে এগিয়ে আসে। ইংরেজরা কয়েক বছর এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পর অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়। ১৯১১ সালে আবার তারা দুই বাংলাকে এক করে দেয়।

ইংরেজের এ হিন্দু তোষণ নীতির ফলে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। মাওলানা শিবলী নোমানীর ভাষায় সর্বপ্রথম যে গুরু-গম্ভীর রচনাটি মুসলমানদের রাজনৈতিক পার্শ্বপরিবর্তনে সহায়তা করে সেটি হচ্ছে নওয়াব ভিকার-উল-মুলকের লেখা একটা মাজাঘষা ভারসাম্য পূর্ণ প্রবন্ধ। এর শিরোনাম ছিল 'মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্থান।' এটি লাক্ষ্মৌ এর মুসলিম গেজেটে ছাপা হয়। এদিকে বাংলায় এ আগুন লেগেছিল। এ আগুনের শিখা নিস্তেজ হতে না হতেই ওদিকে ঘটলো কানপুর মসজিদ ভাঙার ঘটনা। এ ঘটনাটি মুসলমানদের মনের জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিল। কানপুরের ঘটনাটি ছিল মোটামুটি এ রকম। কানপুর মিউনিসিপ্যালিটি একটি সড়ক নির্মাণ করছিল। তাদের পরিকল্পিত সড়কে পড়ে গেলো একটি মসজিদ।

মসজিদের পরিচালকবর্গ নিজেদের ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে সড়কের জন্য মসজিদের গোসলখানা ও পায়খানা ভেঙে দেবার অনুমতি দিল। ব্যস, এতটুকু অনুমতি পেয়েই মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ সমগ্র মসজিদটিই ভেঙে দিতে উদ্যত হলো। সাধারণ মুসলমানরা, সমগ্র আলেম সমাজ এবং হিন্দুস্তানের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান মুসলিম নেতা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। মসজিদ কমিটিকে তারা একথা বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারে তারা এ ধরনের বদান্যতা দেখাতে পারেন কিন্তু মসজিদের সম্পত্তি দান করার কোনো অধিকার তাদের নেই। যাহোক মুসলমানদের এসব বিক্ষোভ হৈ-হাঙ্গামাকে কানাকড়ি গুরুত্ব না দিয়ে নগর কর্তৃপক্ষ মসজিদের একটি অংশ ভেঙে দিল।

সারা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে আগুন লেগে গেলো। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে ফিরিংগী সরকারের এ ন্যক্কারজনক কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকলো। কানুপুরের মুসলমানরা মাথায় কাফন বেঁধে মসজিদের দিকে এগিয়ে এলো। তারা মসজিদের ভেঙে ফেলা অংশ আবার গাঁথতে লাগলো। পুলিশ এসে ফিরে গেলো। মিলিটারী এলো। তবুও মুসলমানরা থামলো না। মিলিটারী গুলী চালালো। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরস্ত্র মুসলমানদের লাশে মসজিদের আঙিনা ভরে গেলো। যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, অনেকেই শহীদ হলো। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় তথাকথিত ন্যায়বাদী ইংরেজ সরকারের ইংগিতেই এসব কিছু হচ্ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘৃণা চরমে পৌঁছুল। মুসলমানদের মধ্যে এলো নতুন জাগরণ।

একজন মুসলিম স্ত্রীর হিম্মত

মাওলানা হাসরাত মোহানী ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে কয়েক বার দীর্ঘ কারাবাসে কাটান। কিন্তু বেগম হাসরাত কখনো ইংরেজ শাসকের সামনে স্বামীর মুক্তির জন্য ফরিয়াদী হয়ে হাযির হননি। কখনো তিনি আদালতেও আপীল করেননি। বরং কারাবাসের মধ্যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে মাওলানা হাসরাত যে পয়গাম পেতেন মাওলানার নিজের ভাষায় তা ছিল নিম্নরূপ ঃ "সাবধান ! সত্যের জন্য নিজের প্রাণের মায়া করবেন না। পৌরুষের সাথে প্রত্যেক বিপদের মোকাবিলা করুন এবং দীন এবং দুনিয়ায় সফলকাম হোন। আমার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। আমি সব রকমের কঠোরতা ও নিপীড়ন বরদাশ্‌ত করে নেব।" এ ধরনের হিম্মতওয়ালী, দৃঢ়চেতা ও স্বদেশের স্বাধীনতাকামী স্ত্রীর উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াস মাওলানা হাসরাতের মানসিক শক্তি হাজার গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

১৯৩৭ সালের ১৮ এপ্রিল বেগম হাসরাতের ইন্তিকাল হয়। শেষবারে তিনি হাসরাতের সাথে হজ্জও করে এসেছিলেন। শেষের কবছর তিনি কঠিন রোগে ভোগেন। মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে এমন কিছু দোষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারদের মতে যার কোনো চিকিৎসাই ছিল না। পালঙ্কের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরে বেশ কিছু কষ্টদায়ক ক্ষতও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবসময় বলতেন ঃ যা আল্লাহর ইচ্ছা, যা তাঁর মর্জী। হাসরাত বলেন ঃ ইন্তিকালের একদিন আগে ফজরের নামাযের আউয়াল ওয়াক্তের আগে কঠিন শ্বাসকষ্টের অবস্থায় ভাঙা ভাঙা শব্দে আমাকে বলতে থাকে ঃ এখন আর আমার কোনো কষ্টের ভয় নেই। কারণ, এই এখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এসেছিলেন। আমি তাঁর জামার আস্তিন ধরে বলেছিলাম, আমাকেও আপনার সাথে মদীনায় নিয়ে চলেন। তিনি বললেন, 'ভয় নেই, আমি শিগ্‌গির তোমাকে আমার কাছে ডেকে নিচ্ছি।' আর মৃত্যুকালীন কঠিন কষ্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, তোমার তেমন কোনো কষ্ট হবে না।' কাজেই এখন আর আমার কোনো চিন্তা নেই।

মাওলানা হাসরাত বলেন, আল্লাহ সাক্ষী, আমার এ বক্তব্যের মধ্যে একটুও অতিরঞ্জন নেই। সত্যি বলতে কি ত্যাগ ও কুরবানী, লজ্জা-শরম ও আত্মমর্যাদাবোধ, বিশ্বস্ততা ও দানশীলতা এবং ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, নিয়তের বিশুদ্ধতা, ইবাদতে আন্তরিকতা, সদ্ব্যবহার, সুরুচি, পবিত্রতা, সবর, অবিচলতা

আর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে নবী প্রেম ও আল্লাহ্ প্রীতির গভীরতার দিক দিয়ে বেগম হাসরাতের মতো এমন এক অসাধারণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব তৎকালীন উপমহাদেশের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে কেন মুসলিম পুরুষদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

হাসরাতের কারা অবস্থানকালে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বেগম হাসরাতের কাছে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন ঃ "মৌলভী হাসরাত ও আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের জনবসতিগুলোয় এখনো পূর্ণ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী মানুষদের অভাব নেই। এটি ইউসুফীয় মর্যাদার উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠান। যখন আমি আপনার হিম্মত ও অবিচলতা এবং এই সাথে একাকীত্ব ও নিষ্করুণ অবস্থার কথা ভাবি তখন আমার মনের অবস্থা ঠিক কোথায় এসে দাঁড়ায় তা বলা আমার পক্ষে দুষ্কর। এটি হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁরই পবিত্র সত্তার অবাধ অনুগ্রহ, যা আপনাকে সমস্ত কাঠিন্য ও বিপদের মধ্যে এমন পর্বত প্রমাণ অটুট সংকল্প দান করেছে, যা আজ কোনো পুরুষের কাছেও দুর্লভ।"

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের পত্রাবলীর মধ্যে নিশাতুন নিসা বেগমের নামে একটি পত্র পাওয়া যায়। তার একটি অংশ দেখুন ঃ "আমার সম্মানিত ও পরমাত্মীয় বোন ! আল্লাহ শিগ্‌গির আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন ! এবং ভালোয় ভালোয় হাসরাতের কারাবাস শেষ হয়ে যাক ! গত পনের ষোল বছর থেকে তো আমি হাসরাতের আল্লাহ্ প্রদত্ত হিম্মত ও দৃঢ়তার প্রশংসায় মুখর। .... কিন্তু আপনার সাথে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক তো হাসরাতের সম্পর্কের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সৃষ্টি হয়েছে বরং গত দু বছর থেকে আপনার হিম্মত, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে আপনার জন্য দোয়া বের হয়। আপনার সাহস ও দৃঢ়তা দেখে মন খুশিতে ভরে ওঠে। ফলে আমার নিজের মনের শক্তিও বেড়ে যায় ......"

আলেম সমাজ মোকাবিলা করলেন

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধে ইংরেজদের লক্ষ ছিল তুরস্কের ওপর চরম আঘাত হানা। তুরস্কের উসমানী খিলাফত যার মধ্যে আসলে খিলাফতী শাসনের ছিটেফোটাও ছিল না কিন্তু মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির পতনের যুগে তা আসলে ছিল বিশ্ব ইসলামী মিল্লাতের ঐক্যের প্রতীক, তাই হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানরা তুর্কী খিলাফতকে কায়েম রাখার জন্য তুরস্কের প্রতি নিজেদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। স্বভাবতই তারা হয়ে উঠলো বৃটিশ-ফরাসী, রুশ ঐক্যজোটের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত হতে থাকল। তুরস্ক বৃটিশ-ফরাসী ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাথে সহযোগিতা করলো। ফলে স্বাভাবিকভাবে উপমহাদেশের মুসলমানরা জার্মানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত ইংরেজ উপমহাদেশের বড় বড় মুসলিম নেতাদের বিভিন্ন স্থানে নজরবন্দী করে রাখল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে রাঁচিতে, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর ও তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলীকে ছশুওয়াড়ায় নজরবন্দী করে রাখল। আর মাওলানা হাসরাত মোহানীকে তো আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে প্রথমে লালতপুর এবং পরে মীরাটের জেলে আটক রাখা হলো।

খেলাফত আন্দোলন ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের শেষ আশা। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে তুরস্কের খেলাফত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে উপমহাদেশের মুসলমানদের শেষ আশাও বিলীন হয়ে গেল। চতুরদিকে অখণ্ড অবিমিশ্র গভীর হতাশার বুকে স্ফুরিত হলো নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের অঙ্কুর। এক মর্দে মুজাহিদ এগিয়ে এলেন ত্যাগ, তিতিক্ষা, ইল্‌ম, তাকওয়া, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সংগঠন প্রতিভা ও লেখনীর দুর্জয় শক্তি নিয়ে। মাত্র এক দশকের মধ্যে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর লেখনী যেন তুফান সৃষ্টি করলো। মৃতপ্রায় মিল্লাতের বুকে নতুন আশার সঞ্চার হলো। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব যে পরিকল্পনা ছিল তা যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে সম্ভবত উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো এবং এর ভৌগোলিক চেহারাও এমনটি হতো না যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

এটি কোনো নতুন ইসলামী আন্দোলন ছিল না। সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের সাথে ছিল এর যোগসূত্র গ্রথিত। পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রাম ও সাদেকপুরের

মুজাহিদদের জিহাদী প্রচেষ্টার সাথে এর সম্পর্ক জড়িত। এটি ছিল সেই আন্দোলনেরই অংশবিশেষ যার সূচনা করেছিলেন আমীরুল মুজাহিদীন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ন্যায় নেকী, তাকওয়া ও ঈমানের রোশনীতে পরিপূর্ণ মর্দে মুমিনগণ জিহাদী ঘোষণার মাধ্যমে এবং কার্যক্ষেত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করে। কিন্তু অন্যেরা নয়, নিজেদের সাথি-সহযোগী বন্ধু-বান্ধবদের চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতায় এ জিহাদ বেশি দূর চলতে পারেনি। শুরুতেই থেমে গিয়েছিল। কিছুদিন পর আবার এ আন্দোলন জেগে উঠেছিল। কিন্তু তখন এর চেহারা পালটে দিয়েছিল। একদিকে আলীগড়ে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে মুসলিম মিল্লাতের দীনি তালিম ও তরবিয়াতের জন্য মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী ও তাঁর সহযোগীরা মিলে দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত করেন দারুল উলম মাদ্রাসা। আল্লাহর গুটিকয় মর্দে মুমিন বান্দা দুনিয়ার লোভ-লালসা মুক্ত হয়ে এখান থেকে কুরআন ও হাদীসের ধারা প্রবাহিত করেন এবং এই সাথে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যার ফলে ইংরেজদের তখ্‌তে তাউস কাঁপতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল অত্যন্ত সতর্ক ও চতুর। বাতাসে নতুন করে বিদ্রোহ ও বিরোধিতার গন্ধ শুঁকে এবার তারা আর পুরাতন অস্ত্র ব্যবহার করলো না। নতুন অস্ত্র এলো তাদের মস্তিষ্কের অস্ত্রাগার থেকে। আর এটা ছিল এমন অস্ত্র যার আঘাতে উপমহাদেশের আজাদী পাগল মুসলমানদের প্রাণবায়ু উড়ে গেল না ঠিকই কিন্তু তাদের আত্মা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো।

ইংরেজ ভালো করেই জেনে নিয়েছিল মুসলমান জাতি কখনো কোনো অবস্থাতেই অন্যের দাসত্বে সন্তুষ্ট থাকবে না। তাই মাত্র কিছুকাল আগেই যে ইংরেজ ছিল মুসলমানদের জানী দুশমন, যারা লাখো লাখো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করে এবং হাজার হাজার মুসলিম নেতৃবর্গকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে এবং দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে এদেশের বুকে নিজেদের কর্তৃত্বের আসন পাকাপোক্ত করেছিল, তারাই আজ মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে মুসলমানদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করতে হবে, তাদের মানসিকতায় এমন পরিবর্তন আনতে হবে যার ফলে তারা নিজেদের পৃথক জাতিত্বের চেতনা হারিয়ে বসে এবং নিজেদের জাতীয় তাহজীব-তমদ্দুন ও চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য ইংরেজ এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করে যা মুসলমানদের মানসিক ও চিন্তাগত দিক

দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ করে দেয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড মেকলের ভাষায় ঃ

"বর্তমানে ভারতবর্ষে আমাদের এমন একটি শ্রেণী তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে যারা আমাদের এবং এই কোটি কোটি মানুষ যাদের ওপর আমরা শাসন চালিয়ে যাচ্ছি তাদের মধ্যে মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। আমাদের এমন একটা শ্রেণীর জন্ম দিতে হবে যারা রক্ত বর্ণের দিক দিয়ে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, চিন্তা-পদ্ধতি, স্বভাব-চরিত্র ও মন-মস্তিষ্কের দিক দিয়ে হবে ইংরেজ।"

মুসলমানদের মধ্যে তখন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী আলেমদের অভাব ছিল না। তাঁরা ইংরেজদের এ চক্রান্ত অনুধাবন করতে পারলেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলেন। উলামায়ে কেরাম এতদিন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিলেন রাজনৈতিক ময়দানে। উপমহাদেশ থেকে ইংরেজদের রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করার জন্য তারা প্রাণপণ করেছিলেন। এজন্য তারা প্রকাশ্য জিহাদেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ অস্ত্রের পথ পরিহার করে ইসলামী মিল্লাতের বৈশিষ্ট খতম করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করলে এ উলামায়ে কেরামও সে পথে মুসলিম মিল্লাতের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এলেন। ইংরেজের নতুন শিক্ষাব্যবস্থার বিষাক্ত ছোবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা এমন একটি নতুন দীনী শিক্ষায়তন কায়েম করলেন যেখানে ইসলামকে তার যথার্থ অবয়বে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তখন সময়টা ছিল বড়ই বিপদ সংকুল। কোনো নতুন ধরনের দীনী মাদরাসা কায়েম করা তখন চাট্টীখানি কথা ছিল না। সরকারী অর্থানুকূল্য বিহীন কোনো মাদরাসার কথা তখন কল্পনাই করা যেত না। যে দিল্লী শহরে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে দীনী মাদরাসার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজারের মত, সেখানে ইংরেজের শাসন শুরু হতেই একটাও উল্লেখযোগ্য মাদরাসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার অপরাধে এ শহরে হাজার হাজার আলেমের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল অথবা তাদেরকে দেশান্তরী করা হয়েছিল। এ শাস্তির কবল থেকে যারা কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন তারা প্রতিদিন নতুন নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। আলেম সমাজের ও সাধারণ মুসলমানদের এহেন দূরবস্থার মধ্যেও কয়েকজন মর্দে মুজাহিদ একটি ছোট্ট থানা শহরে একটি নতুন দীনী শিক্ষায়তনের ভিত্তি রাখেন। এ নতুন শিক্ষায়তনটির নাম দেন তাঁরা দারুল উলুম। একটি ডালিম গাছের ছায়ায় এক নিরবচ্ছিন্ন মানসিক প্রশান্তির

জগতে ডুব দেন উস্তাদ ও শাগরিদ। এ ছোট্ট গাছটির তলায় একদিন মুহাম্মদ কাসেম ও মাহমুদুল হাসান একজন শিক্ষক ও দ্বিতীয়জন ছাত্র–উভয়ে মিলে একান্ত নির্জনে নিরিবিলিতে লোকালয়ের স্পর্শ থেকে দূরে প্রায় নামহীন গোত্রহীন পরিবেশে যে শিক্ষায়তনটি গড়ে তোলেন, কে জানতো একদিন এ শিক্ষায়তনটি সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারা পালটে দেবে !

দেওবন্দে দীনী শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন

উত্তর ভারতে হিমালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত সাহারানপুর জেলার একটি ছোট্ট মফঃস্বল শহর দেওবন্দ। স্থানীয় প্রবাদে বলা হয়, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর এ জনপদটি গড়ে ওঠে। এটি যে, উপমহাদেশের একটি প্রাচীনতম জনপদ তাতে সন্দেহ নেই। বলা হয়ে থাকে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমলে তাঁর কয়েকজন মুবাল্লিগ ও দূত এ এলাকার লোকদের ফরিয়াদ শুনে এখানে আসেন। এখানে তখন দেও তথা জিনদের উৎপাত খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল। হযরত সুলাইমানের দূতেরা জিনদের বন্দী করে ফেলেন। পরবর্তীকালে এখানকার একটি পুরানো কুয়া খনন করতে গিয়ে তার মধ্যে একটি জিনের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এ বর্ণনাটি এখানে বহুল প্রচলিত। এজন্য এলাকার নাম হয়ে যায় দেওবন্দ। এছাড়াও হিন্দুস্তানের অন্যান্য এলাকার ন্যায় এ এলাকাও দেবদেবী পূজার আধিক্য ছিল যার ফলে এলাকার নাম দেওবন্দ হয়ে যায় বলে কথিত আছে।

১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রথম আজাদী সংগ্রামের ব্যর্থতার পর সর্বত্র ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে তারি অংশ হিসেবে দেওবন্দে ৪৪জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। যে আম গাছের ডালে লোকদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিল সেগুলো আজো রয়েছে। পরবর্তীকালে এগুলো নাম হয়ে যায়, 'শূলিওয়ালা'। তারপর সেই মহান দিনেরও আগমন শুরু হয় যেদিন দেওবন্দের সরজমিন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আমানত ইলমে দীনের স্রোতধারার স্ফুরণ ঘটে। এ স্রোতধারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের লাখো লাখো মৃত প্রাণে জীবনের জোয়ার আনে। ছাত্তা মসজিদের আঙিনায় একটি ছোট্ট আনার গাছের তলায় উস্তাদ ও ছাত্র দুজনে মিলে (দুজনেরই নাম মাহমুদ) একটি ছোট্ট মাদরাসার উদ্বোধন করেন। এ মাদরাসার ভিত্তি রাখেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম মীরাটের মুল্লা মাহমুদকে দেওবন্দে এনে মাওলানা কাসেম নানুতবী তাঁর ওপর দরস ও তাদরীসের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার খবর মক্কা প্রবাসী হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে পৌঁছলে তিনি সাথে সাথে বলে ওঠেন ঃ "সুবহানাল্লাহ ! না জানি শেষ রাতে কত শত আল্লাহর বান্দা সিজদাবনত হয়ে তাদের মহান রবের কাছে কান্নাকাটি করে এ দোয়া করেছে–হে আমাদের রব ! হিন্দুস্তানে ইসলামকে জিইয়ে রাখার এবং

ইসলামের হেফাজত ও ইলমের হেফাজতের কোনো উপায় সৃষ্টি করে দাও ! এ মাদরাসাটি সেই প্রভাতকালীন দোয়ার ফসল।"

দেওবন্দের অধিকাংশ মুসলিম পরিবার খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের মধ্যে আবার প্রাধান্য দেখা যায় সিদ্দীকী ও উসমানীদের। মৌলভী যুলফিকার আলীর পরিবার ছিল এদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও সম্মানিত। যুলফিকার আলী সাহেব দিল্লীর আরবী কলেজের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন দুই কন্যা ও চার পুত্রের জনক। চার পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন মাহমুদ হাসান। মাহমুদ হাসান ১৮৫১ সালে বেরিলিতে তাঁর পিতার কর্মস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয়। সমকালীন মুত্তাকী বুযুর্গ আলেম মিঞাজী মংগলোরীর কাছে কুরআন মজীদ পড়েন। মিঞাজী আবদুল লতিফের কাছে ফারসী সবক শুরু করেন এবং আরবী পড়েন নিজের চাচা মশহুর আলেম মৌলভী শিহাব আলীর কাছে।

মাহমুদ হাসানের বয়স যখন পনের বছর তখন কতিপয় মর্দে মুমিন ও মর্দে মুজাহিদের সহায়তায় দেওবন্দে একটি আরবী মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেমের প্রস্তাব অনুসারে মাসিক পনের টাকা বেতনে মুল্লা মাহমুদ সাহেব দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম উস্তাদ নিযুক্ত হন। আর এ মাদরাসার প্রথম ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেন মাহমুদ হাসান। এ মাহমুদ হাসানই পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে হিন্দুস্তান মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শায়খুল হিন্দ খেতাব লাভ করেন। মুল্লা মাহমুদ সাহেব ইলমে হাদীস ও ফিক্‌হের মশহুর উস্তাদ ছিলেন। তিনি মিরাটের মাতবায়ে হাশেমীতে চাকুরীরত ছিলেন। সেখান থেকে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী তাঁকে ডেকে এনে দেওবন্দ মাদরাসায় বসিয়ে দেন।

মুল্লা মাহমুদ ছিলেন দেওবন্দের অধিবাসী। তিনি অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর ও মুত্তাকীর জীবন যাপন করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র) ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ন্যায় তিনিও ইলমে হাদীসে শিক্ষালাভ করেন শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহির পুত্র শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলবীর কাছে।

মুল্লা সাহেব দশ বছর পর্যন্ত দেওবন্দ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। অতপর ১৮৮৬ সালে ইন্তিকাল করেন।

দেওবন্দে মাওলানা মাহমুদুল হাসান

দুনিয়ার কোলাহল থেকে অনেক দূরে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পরিবেশে দেওবন্দের অখ্যাত পল্লীতে যে দীনি শিক্ষায়তনটি গড়ে উঠেছিল দেখতে না দেখতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে বেনারস, পাঞ্জাব এমন কি সুদূর কাবুল থেকেও শিক্ষার্থীদের ভীড় জমে ওঠে। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর প্রচেষ্টায় হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এখানে জমায়েত হতে থাকেন। মাদরাসা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী তাঁর একশো টাকা বেতনের সরকারী চাকুরী ছেড়ে মাত্র বিশ টাকা মাসিক বেতনে মাদরাসার প্রধান মুদাররিসের পদে যোগ দেন। ১২৮৬ হিজরীতে ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যাবার কারণে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী নিজেও তাঁর বাইরের চাকুরী ত্যাগ করে মাদরাসায় যোগ দেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাহমুদুল হাসান তার হাদীসের সমস্ত কিতাব মাওলানা কাসেম নানুতবীর কাছেই পড়েন। মাওলানা তাঁর এ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্রটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং হৃদয় উজাড় করে নিজের সমস্ত জ্ঞান ও ইলম তাকে দান করেন।

মাদরাসার শেষ বর্ষের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হবার পর মাহমুদুল হাসানকে দারুল উলুমে সহকারী মুদাররিসের পদে নিযুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে তাঁর ইলমী যোগ্যতা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন হতে থাকে। ফিক্হ ও হাদীসের বড় বড় কিতাবও তিনি পড়াতে থাকেন। মাওলানা মাহমুদুল হাসানের শিক্ষকতার তখনও মাত্র তৃতীয় বর্ষ চলছিল। এমন সময় মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র) ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) হজ্জ সফর করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁদের হজ্জ সফরের কথা শুনে শহরের শত শত লোক তাদের সহযোগী হবার খায়েশ প্রকাশ করে। এদের মধ্যে ধনী-গরীব, প্রভাবশালী সাধারণ মানুষ, আলেম-জাহেল—সব পর্যায়ের লোকই ছিল। দেওবন্দ মাদরাসা প্রায় খালি হয়ে যায়। ছাত্র-শিক্ষক সবাই এ সফরে শরীক হয়। এমনকি সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদরাসার শিক্ষকরাও এ হজ্জ সফরের সহযোগী হন। মাওলানা মাহমুদুল হাসান এতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। উস্তাদদের বিশেষ করে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবীর সাথে হজ্জ সফর তাঁর জীবনের একটা পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বলে তিনি মনে করতে থাকেন। দেওবন্দ থেকে বোম্বাই এবং সেখান থেকে তের দিনের সামুদ্রিক সফরের পর এ বিরাট কাফেলাটি জেদ্দায় পৌঁছে। সেখান থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় পৌঁছে। কাবার তাওয়াফ

করার পর সেখানে শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও সাক্ষাত করেন। মক্কা থেকে মদীনায় এসে কাফেলাটি বিশ দিন অবস্থান করে। সেখানে তারা সাক্ষাত করেন হাদীসের মহান শিক্ষক হযরত শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলবী মুহাজির মাদানীর সাথে। তিনি মূলত ছিলেন হিন্দুস্তানের বাসিন্দা। হিন্দুস্তানের এ আলেমগণ প্রায় সবাই ছিলেন তার ছাত্র। কিছু দিন তাঁর দরসে অবস্থান করে মাওলানা মাহমুদুল হাসানও তাঁর থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। মক্কায় ফিরে আসার পর মাওলানা মাহমুদুল হাসান হাজী ইমদাদুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে খেলাফতও লাভ করেন।

হজ্জের জন্য তারা ছমাস বিদেশে অবস্থান করেন। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর মাওলানা মাহমুদুল হাসান দরস ও তাদরীসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় আশরাফ আলী থানবী দারুল উলূমে ভর্তি হন। বেশির ভাগ সবক তিনি মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাছে পড়তে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাঁর সবচেয়ে স্নেহভাজন ছাত্রে পরিণত হন। হঠাৎ ১২৯৭ হিজরীতে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকাল হয়। তাঁর বয়স খুব বেশি হয়নি। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর। মাওলানা নানুতবীর ইন্তিকালে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায় নেমে আসে। এতে সবচেয়ে বেশি শোকার্ত হন মাওলানা মাহমুদুল হাসান। শোকের আধিক্যে এমনকি তিনি কিছুদিনের জন্য মাদরাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব অনেক বুঝাবার পর আবার তিনি অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তার আগের হাসিখুশী ভাব একেবারে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। ইবাদাত বন্দেগীর মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এখন তিনি নিয়মিতভাবে এশার নামাযের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অধ্যয়ন করতে থাকেন। তারপর সামান্য সময় বিছানায় আরাম করার পর উঠে তাহাজ্জুদে মশগুল হয়ে যান। তাহাজ্জুদের পর ছাত্রদের সবক পড়াতে বসে যান। এরপর ফজরের নামায শেষে মাদরাসার নিয়মিত অধ্যাপনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সারাদিন এ কাজে নিয়োজিত থাকতেন। এ ছিল তাঁর নিত্যকার রুটিন।

১৩০৫ হিজরীতে তিনি দারুল উলুমের প্রধান মুদাররিসের পদে নিযুক্ত হন। এ সময়ের পর থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন। সবসময় আল্লাহর কাজ ও দীনী দায়িত্ব মনে করেই তিনি এ কাজ করে গেছেন। এর বিনিময়ে মাসিক সামান্য কিছু অর্থ গ্রহণ করতেন।

কিন্তু পরে তাও নেয়া বন্ধ করে দেন। প্রায় উনপঞ্চাশ বছর তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করে যান। এ সময় উপমহাদেশের প্রায় সব এলাকায় তাঁর ছাত্রদের দল ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। উপমহাদেশের বাইরেও কাবুল, কান্দাহর, বলখ, বুখারা, মক্কা, মদীনায়ও এ সিলসিলা ছড়িয়ে পড়ে।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান সারা জীবন চাটাইয়ের ওপর বসে ছবক দিয়েছেন। তাঁর দরসের পরিবেশ হতো অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ ও শান্ত-গম্ভীর। অন্যান্য মাদরাসার সনদ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছাত্ররাও তাঁর দরসে শামিল থাকতো। অত্যন্ত ধীরে সুস্থে ভাব গম্ভীর পরিবেশে তিনি দরস দিতেন। অন্যদের হেয় ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা তাঁর দরসের লক্ষ হতো না। মাওলানার দরসের পরিবেশ দেখে অতীতের ফকীহ, সালাফে সালেহীন ও আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনদের দরসে হাদীসের চিত্র সামনে ভেসে উঠতো। কুরআন, হাদীস ও ফকীহ ইমামদের মযহাব তাঁর কণ্ঠস্থ। নিজের মাতৃভাষার ওপর দখল অসাধারণ। নিজের বক্তব্য পেশ করার সময় মনে হতো ভাষার চাবিকাঠি তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। দুর্বল ও রোগা-পাতলা শরীরের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মনে হতো যেন আল্লাহর শার্দুল স্বাধীনভাবে চতুরদিকে বিচরণ করছে।

তাঁর সরাসরি ছাত্রদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র), মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র), মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র), মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (র), মাওলানা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ (র), মাওলানা মনসুর আনসারী, মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলুবী। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ছিল তার গভীর মানসিক সম্পর্ক। মাওলানা নানুতবীর ইন্তিকালের পর মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে তাঁর এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দীর্ঘ দিন তিনি দেওবন্দ থেকে গাংগুহ যেতেন। মাওলানা গাংগুহীর পেছনে জুমার নামায পড়তেন। এ বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার জন্য তিনি সকালে ফজরের নামাযের পরে বের হয়ে পড়তেন। নামায শেষে আবার পায়ে হেঁটে দেওবন্দে চলে আসতেন।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন নির্লোভ, দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগী, শুধুমাত্র ইল্মী খিদমতে আত্মনিয়োগকারী মুসলমান হলেও তাঁর বুকে ছিল একটি সংবেদনশীল মুমিনের হৃদয়। সবসময় মুসলমানের দুঃখে ব্যাথা অনুভব করতেন। আর এটাই ছিল

স্বাভাবিক। কারণ মুজাহিদে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী এবং মুজাহিদে আযম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কীর তিনি ছিলেন যথার্থ উত্তরসূরী। তাই তুরস্কে সে সময় মুসলমানদের ওপর যে জুলুম অত্যাচার চলছিল তাতে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছিল।

শায়খুল হিন্দ ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি মূলত ছিলেন একজন মুত্তাকি, পরহেজগার ও ইবাদতগুজার শিক্ষাব্রতী। সারা জীবন হাদীসের পঠন পাঠনেই ব্যস্ত থাকেন এবং জনগণের ঈমান, আকীদা ও চরিত্র সংশোধনের কাজেই নিয়োজিত থাকেন। জেনে বুঝে কখনো সস্তা সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের পথে প্া বাড়াননি। অমুসলিম ও ইসলামী বৈরী সরকারের অধীনে জীবন যাপন করা একটা মারাত্মক ধরনের আপদই বলতে হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে বহু ইসলামী আহকাম মুলতবী হয়ে যায়। যেগুলো প্রবর্তনের জন্য মুসলিম শাসকের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে শায়খুল হিন্দ হিন্দুস্তানে আল্লাহর ফায়সালার ওপর রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের ওপর কোথাও জুলুম নির্যাতন হলে মাওলানা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বুকে ছিল একটি সংবেদনশীল মুমিনের হৃদয়। দুশমনের পানজা থেকে মজলুম মুসলমানদের রক্ষা করার এবং তাদের দুঃখে শোকে সাহায্য সহায়তা দান করার জন্য তিনি সবসময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের তিনি মনে করতেন একটি দেহের মতো। এর কোনো একটি অংশে আঘাত লাগলে সর্বাঙ্গ দিয়ে তিনি তা অনুভব করতেন।

হাজার হাজার মাইল দূরে তখন চলছিল তুর্কী-রুশ লড়াই। এ লড়াইয়ের ঘটনাবলী শুনে শুধু তিনিই নয়, তার উস্তাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রাণও কেঁদে উঠেছিল। হাদীস-কুরআন পঠন-পাঠন ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো কাজই তাদের ছিল না। তারা ফজরের নামাযের পর দৈনিক পত্রিকার অপেক্ষায় বসে থাকতেন। খাদেম দ্রুত ডাকঘরে চলে যেতো। সেখান থেকে পত্রিকা নিয়ে আসতো। পত্রিকায় শত্রুদের শক্তিমত্তা, বিজয় ও মুসলমানদের দুর্বলতা ও পরাজয়ের খবর পড়ে তাদের চোখে পানির ধারা প্রবাহিত হতো। তারা আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কিছু করতে প্রস্তুত হন। দিনের বেলা বুখারী শরীফ খতম হতে থাকে, বাইদাবীর দরস চলতে থাকে। উলামা তালাবা এবং স্থানীয় সৎ হৃদয়বান মুসলমানেরা হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে থাকে। আঁধার রাতে বুজর্গানে দীনেরা সিজদানবত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে মজলুম মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। নিজেদের জন্য হাত পাতা যারা কুফরীর পর্যায়ে মনে করতেন তারা মজলুম তুর্কীস্তানী মুসলমানদের জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরতে থাকেন। দু

পয়সা চার পয়সা, দুআনা-চার আনা যাই ওঠে তাই জমা করতে থাকেন। এভাবে হাজার হাজার টাকা জমা করে দুর্গত মুসলমানদের জন্য পাঠান।

১৩৩০ হিজরীতে উসমানী সালতানাত বলকান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ও শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা আবার তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। আল্লাহর দরবারে দোয়া করা ছাড়া একবারও তাঁরা দুর্গত, অনাহার ক্লিষ্ট, দেশ থেকে বিতাড়িত তুর্কী ভাইদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। এজন্য তাঁরা ব্যাপক আন্দোলন করেন, সভা সমিতির অনুষ্ঠান করেন এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে এবার শায়খুল হিন্দ নিজে বক্তৃতা মঞ্চে নামেন। দারুল উলুম দেওবন্দে 'হেলালে আহমর' নামে একটি মজলিস কায়েম করেন। তুর্কীদের সাহায্য করার জন্য একটি ফত্ওয়া ছাপিয়ে নেন লাখো লাখো কপি। সারা হিন্দুস্তানে এগুলো ছড়িয়ে দেন। এ কাজের ডামাডোলে দারুল উলুমের ক্লাশ কয়েকদিন বন্ধ রাখতে হয়। মুদাররিসগণ নগরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তুরস্কের মুসলমানদের ওপর দুশমনরা কোন্ ধরনের জুলুম চালাচ্ছে এবং কিভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে থাকেন। শায়খুল হিন্দের বহু ছাত্র সারা হিন্দুস্তান সফর করে মুসলিম জনতাকে এ ব্যাপারে সজাগ করেন। তিনি নিজে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে আনেন। মুদাররিসরা নিজেদের পুরো মাসের বেতন চাঁদার তহবিলে জমা করে দেন। সেই জামানায় বোম্বাই ন্যাশনাল ব্যাংক মারফত তুরস্কের মজলুম মুসলমানদের জন্য এক লাখ টাকা পাঠানো হয়।

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বলকান ও তারাবিলাসের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, তাঁদের ওপর অনুষ্ঠিত জুলুম নির্যাতন এবং দেশের অভ্যন্তরে ইংরেজ শাসকদের ক্রমবর্ধিষ্ণু অত্যাচার নিপীড়ন এবং লুণ্ঠন ও বর্বরতার ক্রমবর্ধিত পরিসর শায়খুল হিন্দকে এ মর্মে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ফলাফল ও পরিণতির কথা চিন্তা না করে বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ইতিপূর্বে শায়খুল হিন্দের উস্তাদগণ ১৮৫৭-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলতে তিনি দেখেছেন হামেশা কখনো ধিকি ধিকি আবার কখনো দাউ দাউ করে। তাই ইংরেজ শাসন খতম করার উদগ্র কামনা ও জয্বা তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের দুর্বল অবস্থা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াকেই তিনি সময়ের প্রয়োজন মনে করেন।

ইসলামী হুকুমাত কায়েমই লক্ষ

মাওলানা মাহমুদুল হাসান এমন এক সংকট সন্ধিক্ষণে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিলেন যখন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর ভাষায়, "ফিরিংগীরা জনগণের মনমস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে অনেক লোক আল্লাহকেও ততটা ভয় করতো না যতটা ভয় করতো ইংরেজকে।" চারদিকে ছিল গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিছানো। ইংরেজের বিরুদ্ধে কারোর টু শব্দটিও করার ক্ষমতা ছিল না এর মধ্যে একটা নেহাতই দীনী মাদরাসার একজন গরীব আলেম হ্যাংলা পাতলা দুর্বল শারীরিক কাঠামোর অধিকারী ব্যক্তি কেমন করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন ? এটা সত্যিই কাল ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ছিল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বড় বড় উলামা ও মাশায়েখরা যেহেতু তাঁকে হতাশ করেছিল এবং তিনি নিজেও বলতেন, মশহুর মৌলভী ও পীরদের থেকে কোনো আশা না করা উচিত। এজন্য তিনি নিজের ছাত্রবৃন্দ ও আন্তরিকতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান মুরীদ গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করেন এবং তাদেরকে নিজের সমমনা করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

এ সময় উপমহাদেশের আর এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। মাওলানা আজাদ তাঁর তরজমানুল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "১৯১৪ সালের কথা। আমার মনে হলো, হিন্দুস্তানের উলামা ও মাশায়েখদেরকে সময়ের প্রয়োজন ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করা উচিত। সম্ভবত তাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সত্যাশ্রয়ী ও কর্ম প্রবণ উলামা বের হয়ে আসতে পারে। আমি প্রচেষ্টা চালাতে থাকলাম। কিন্তু মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই সাফ জবাব দিয়ে দিলেন যে, তোমার এ দাওয়াত একটা ফেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আমার ডাকে সাড়া দিলেন তিনি হচ্ছেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী।"

শায়খুল হিন্দের হৃদয় মস্তিষ্কে যে আগুন লেগেছিল তা কোনো সাময়িক আগুন ছিল না। দীর্ঘকাল থেকে এ আগুনের শিখা তার হৃদয় জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। হিন্দুস্তানে ইংরেজদের জুলুম নির্যাতন যতই বাড়ছিল ততই তাঁর হৃদয় পুড়ে অংগার হয়ে যাচ্ছিল। আর নিজের উস্তাদ শায়খদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন এবং ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করার জন্য তাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের কিছু অংশ তাঁর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তিনি এ প্রচেষ্টায় অগ্রবর্তী হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি নিজের শক্তিশালী ও সুযোগ্য সহযোগীর খোঁজে চারদিকে তাকালেন।

তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো তাঁরই ছাত্র মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর ওপর। মাওলানা সিন্ধী তখন দিল্লীতে মাদরাসা নাযারাতুল মা'আরিফ কুরআনিয়ায় শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম যুবকদের মন মস্তিষ্কে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে যে বেদীনী অনুপ্রবেশ করছে তার প্রভাব থেকে তাদেরকে মুক্ত করা। তাদেরকে এমনভাবে কুরআনের শিক্ষা দেয়া যার ফলে দীন ইসলাম সম্পর্কে তাদের সবরকমের সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যায় এবং তারা পাক্কা মুসলমানে পরিণত হয়।

মাওলানা শায়খুল হিন্দ উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর মাদরাসায় গিয়ে তাঁকে বললেনঃ "মৌলভী উবাইদুল্লাহ ! সন্দেহ নেই, তুমি নিজের জায়গায় ঠিক কাজ করে যাচ্ছ। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, ইংরেজদের শাসন কর্তৃত্ব যদি হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে যে সময়ে তুমি তোমার এ মাদরাসা থেকে দশ বিশজন সহী চিন্তার অধিকারী দীনদার মুসলমান তৈরি করবে সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজ হাজার হাজার মুসলিম যুবকদের বেদীন বানিয়ে দেবে।" শায়খুল হিন্দ যথার্থই বলেছিলেন। ডবলিউ ডবলিউ হান্টার তার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আমাদের স্কুল ও কলেজে পড়া কোনো হিন্দু বা মুসলমান যুবক এমন নেই যে, তার ধর্মীয় মনীষীদের আকীদা বিশ্বাসকে ভ্রান্ত মনে করে না।" যাহোক সিন্ধী তার উস্তাদের এ নতুন পরিকল্পনা বুঝতে পারলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে যে কোনো প্রকার শ্রম দেবার এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

একজন নওমুসলিমের ঈমানী জযবা

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী একজন নওমুসলিম। পাঞ্জাবের এক শিখ পরিবারে তাঁর জন্ম। সেদিন ১৮৭২ সালের ১০ মার্চ। পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার একটি ছোট গ্রাম নাম চিয়াঁওয়ালী। এ গ্রামে রাম সিং নামে এক শিখের গৃহে ভূমিষ্ঠ হয় একটি শিশু সন্তান। তার দাদার নাম জিপত রায় এবং পরদাদার নাম গুলাব রায়। এটি একটি হিন্দু পরিবার। এরা পেশায় স্বর্ণকার। এ শিশুর পিতা স্বেচ্ছায় শিখ ধর্ম গ্রহণ করে। শিশুর জন্মের চার মাস পূর্বে পিতা রাম সিংহের মৃত্যু হয়। দু বছর পর দাদা জিপত রায়ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেন। বিধবা মা শিশু সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে পিতৃগৃহে চলে আসেন। শিশুর দুই মামু বাস করতো ডেরা গাজী খাঁ জেলার জামপুর কসবায়। তারা পেশায় ছিল পাটওয়ারী। স্বামীর মৃত্যুর পর শোক জর্জরিত বিধবা মা কেবলমাত্র শিশু সন্তানের মুখ চেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকে। এ শিশুর একটি বড় বোন ছিল। তার নাম জীওনী।

শিশুটি ছিল নানার সমগ্র পরিবারের চোখের মণি। মায়ের আদর এবং সমগ্র পরিবারের স্নেহ মমতার ছায়ায় অতি যত্নে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে। শৈশবের প্রথম গণ্ডী পার হতে না হতেই মামু ১৮৭৮ সালে তাকে ভর্তি করে দেয় জামপুর উর্দু স্কুলে। ডেরা গাজী খাঁ পাঞ্জাবের একটি জেলা হলেও তার সীমান্ত একদিকে সিন্ধু এবং অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাথে মিশে গিয়েছিল। এ জেলায় অধিকাংশ মুসলমানের বাস। পীর ও ফকিরদের প্রভাব ও মর্যাদা ছিল জেলার সর্বত্র বিস্তৃত। জনসাধারণের মধ্যে সুফীবাদের চর্চা ছিল ব্যাপকভাবে। শত শত বছর থেকে এ সরজিমনে বড় বড় সুফী, আউলিয়া মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামের জন্ম হয়েছে। তাঁদের মুখ নিসৃত বাণী, আদর্শ কর্মধারা এবং স্বর্ণোজ্জ্বল স্মৃতি এলাকার সর্বত্র শ্রুত ও পরিদৃষ্ট হয়।

এ পরিবেশে এ শিখ শিশুটির জীবনের প্রথম চৈতন্য সঞ্চার হয়েছিল। এভাবে অতিক্রান্ত হয়েছিল তার জীবনের দশ বারোটি বছর। শিখ ধর্ম শুরু হয়েছিল বাবা গুরু নানক থেকে। বাবা ছিলেন একজন দরবেশ। মুসলিম সুফীদের শিক্ষার সাথে তাঁর শিক্ষার গভীর মিল ও সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিখ ধর্ম যে রূপ নেয় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তার ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

মোটামুটি বলা যেতে পারে, ইসলাম ও ইসলামী তাসাউফের আসল শিক্ষা থেকে শিখ ঘরানাগুলোর অবস্থান খুব বেশি দূরে ছিল না। সংক্ষেপে শিখ ধর্মের চারটি শিক্ষাকে সামনে আনা যেতে পারে। এক, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অনীহা। দুই, আল্লাহর একক অস্তিত্ব স্বীকার করা। তিন, সকল সৃষ্টিকে সমান মনে করা। চার, ভালো কাজের মধ্যে আসল পুন্য রয়েছে বলে মনে করা। বাবা গুরু নানক তাঁর অনুসারীদের এ শিক্ষাগুলোই দিয়েছিলেন।

শিশুটি এতদিনে পরিণত হয়েছিল একটি উঠতি কিশোরে। মুসলমানদের জীবনকে খুব নিকট থেকে অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেছিল সে। যেসব বিষয়কে এতদিন মনের গহীনে সঠিক ও সাচ্চা মনে করে এসেছে সেগুলো শিখ ও হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতির তুলনায় ইসলামেই বেশি রয়েছে বলে সে অনুভব করছিল। এটা ছিল এই কিশোরের নিজস্ব অনুভূতি এবং তার গভীর অনুভূতি প্রবণ মনের বিচার বিবেচনা। কোনো মুসলমান বন্ধু যুক্তি দিয়ে তাকে এসব কথা বুঝিয়ে দেয়নি। কোনো শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী মুসলমানের মুখ থেকেও সে এগুলো শোনেনি।

সে দেখলো শিখেরা আল্লাহকে এক বলে মানে এবং মুসলমানরাও। কিন্তু ইসলামে এক আল্লাহর ধারণা শিখদের ধারণার চেয়ে অনেক স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সকল প্রকার আবরণ মুক্ত। মানুষের মধ্যে সাম্য উভয় ধর্মে আছে। কিন্তু ইসলাম যেভাবে বাস্তব জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে শিখদের তুলনায় তা অনেক উঁচু মানের। একটুখানি কিশোরের মনে এসব চিন্তার ঢেউ খেলে যেতে থাকলো। পেরেশান হয়ে পড়লো সে। কত নির্ঘুম রাত তার এভাবে কেটে গেলো। তার পরিবারের সমস্ত লোকেরা যে ধর্মকে সত্য বলে মানে এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যে ধর্মের সেবা করাকে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় কাজ মনে করে, সে ধর্ম সত্য নয় বরং ইসলাম সত্য, এ চিন্তা তার মনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যতই সে এভাবে চিন্তা করতো ততই ইসলামের সত্যতা তার মনের গহীনে প্রবেশ করে যেতো।

ভেবে কোনো কুলকিনারা পায় না সে। এখন সে কি করবে? মন বুদ্ধি ও বিবেকের কথা যদি মানে এবং সত্যকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে তাকে বাড়িঘর ছাড়তে হবে। যে মমতাময়ী মা নিজের শরীরের রক্ত সিঞ্চন করে তাকে মানুষ করেছে এবং নাজানি তাকে ভিত্তি করে তার আশা আকাঙ্ক্ষার কত বড় প্রাসাদ গড়ে উঠেছে সেই মাকে ত্যাগ করতে হবে। একমাত্র বোন যে তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং যে মামু তার প্রতি একান্তই স্নেহশীল তাদেরকেও ত্যাগ করতে হবে। মোটকথা সমস্ত পরিবার থেকে তাকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।

সে অনেক চিন্তা ভাবনা করলো। কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারলো না। একদিকে মনের ইচ্ছাও পূরণ হবে আবার অন্যদিকে মা বোন আত্মীয় স্বজনদের থেকে সম্পর্কও ছিন্ন হবে না এমন কোনো পথই দেখছিল না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এ ভাবনায় ডুবে রইলো সে। তারপর একদিন এলো। একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হলো তাকে। এর বর্ণনা এই কিশোরের নিজের জবানীতে শুনুন ঃ

'তখন আমি মিডল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার জন্য গৃহ ত্যাগ করলাম। এ সময় দু বছর থাকলাম শিয়ালকোটে। কাজেই স্কুলে এক ক্লাশ পিছিয়ে পড়লাম। নয়তো প্রথম থেকেই ছাত্র হিসাবে স্কুলে বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলাম। ১৮৮৪ সালে আরিয়া সমাজের এক ছাত্রের কাছ থেকে পেলাম 'তোহফাতুল হিন্দ' নামে একটি বই। এ বইটি পড়তে পড়তে ইসলামের সত্যতার প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকলো। আমাদের নিকটবর্তী কোটলা মোগলানের প্রাইমারী স্কুলের কয়েকজন হিন্দু ছাত্রের সাথে বন্ধুত্ব হলো। তারাও ছিল তোহফাতুল হিন্দের ভক্ত। এ বন্ধুদের সহায়তায় মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদের 'তাকবীয়াতুল ঈমান' বইটি পেলাম। এ বইটি পড়ার পর ইসলামী তাওহীদ ও শিরকের চেহারা একদম সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এরপর মৌলভী মুহাম্মদ লাক্ষৌবীর 'আহওয়ালুল আখেরাত' বইটি হাতে এলো। এখন আমি নামায শিখে ফেলেছিলাম। তোহফাতুল হিন্দের লেখকের নামে নিজের নাম ঠিক করে ফেলেছিলাম উবাইদুল্লাহ। 'আহওয়ালুল আখেরাত' (আখেরাতের ঘটনাবলী) বইটি বারবার পড়া এবং 'তোহফাতুল হিন্দ' বইয়ের যে অংশে নওমুসলিমদের অবস্থায় লিখিত হয়েছে সেটি বিশেষভাবে চোখের সামনে থাকার কারণে এখন আমি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা দ্রুত প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম। নয়তো ইতিপূর্বে আমি ভেবে রেখেছিলাম পরবর্তী বছরগুলোতে যখন কোনো হাই স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করবো কেবল তখনই নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবো।

'১৮৮৭ সালের ১৫ আগস্ট আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লাম। আমার সাথে ছিল কোটলা মোগলানের এক বন্ধু আবদুল কাদের। আমরা দুজন আরবী মাদরাসার এক ছাত্রের সাথে মুজাফ্ফর গড় জেলার কোটলা রহম শাহে পৌঁছে গেলাম। জানতে পারলাম আমার কিছু আত্মীয় আমার পিছু নিয়েছে। কাজেই আমরা সিন্ধুর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথে ঐ মাদরাসা ছাত্রের কাছে আমি আরবী সরফ-এর কিতাব পড়তে শুরু করলাম। আল্লাহর খাস রহমতে যেমন জীবনের শুরুতে জ্ঞান

বুদ্ধির উন্মেষের সাথে সাথেই ইসলামকে অনুধাবন করা সহজ হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি তাঁর খাস রহমতের আওতায়ই সিন্ধুতে হযরত হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক ভরচুণ্ডীর খিদমতে পৌঁছে গেলাম। হযরত হাফেজ সাহেব ছিলেন সমকালের জুনাইদ বাগদাদী ও সাইয়েদুল আরেফীন। তাঁর সোহবতে থাকলাম কয়েক মাস। এর সুফল পেলাম হাতে হাতে। একজন জন্মগত মুসলমানের মতো ইসলামী জীবনাচার আমার স্বভাব জাত হয়ে গেলো। হযরত একদিন আমার সামনে তাঁর লোকদের বললেন, উবাইদুল্লাহ আল্লাহর জন্য আমাদেরকে তার মা বাপ বানিয়ে নিয়েছে। হযরতের মুখ নিসৃত এ মুবারক শব্দগুলো এখনো আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। আমিও হযরতকে নিজের দীনী বাপ মনে করি এবং কেবল এজন্যই আমি সিন্ধুতে নিজের স্থায়ী স্বদেশ ভূমিতে পরিণত করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত হাফেজ সাহেবের হাতে কাদেরী রাশেদী তরীকায় বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।'

নওমুসলিম উবাইদুল্লাহর সৌভাগ্যের সত্যিই কোনো তুলনা হয় না। শরীয়তী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এমন এক ঝরণাধারায় তিনি অবগাহন করতে পেরেছিলেন যা শত শত বছর থেকে সিন্ধু ও রাজস্থানের বালুকাময় প্রান্তরকে সিক্ত করেছিল। হযরত পীর সাইয়েদ মুহাম্মদ রাশেদ আলাইহির রহমাহ-এ রূহানী সিলসিলাটিকে এতবেশি বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর নামেই এ সিলসিলা 'কাদেরিয়া রাশেদিয়া' নামে পরিচিত হয়। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'পুরানে চেরাগ' গ্রন্থে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পীর সাইয়েদ মুহাম্মদ রাশেদ এ এলাকায় ইল্মী ও রূহানী পর্যায়ে এমন এক বিরল মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যেমন তাঁর সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মর্যাদা ছিল উত্তর ও পশ্চিম হিন্দুস্তানে। সাইয়েদ সাহেবের সন্তানরা এলাকার আমজনতার ইল্মী, রূহানী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করে। ইংরেজের কুফরী ও মুশরিকী শাসনের বিরুদ্ধে আজাদীর জিহাদ ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রামে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করে। পীর সাইয়েদ রাশেদের খলীফা সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ পীর পাগারে এবং সাইয়েদ হাসান শাহ সুই শরীফের আমলে হযরত সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁর সংগী সাথিরা সমগ্র রাজস্থান ও সিন্ধু এলাকা সফর করার সময় তাদের দুজনের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা তাঁদের কাছে অবস্থান করেন। সাইয়েদ ব্রেলভীর জিহাদ আন্দোলনে উভয় বুযর্গের বিশাল দলবল মুজাহিদদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। এ সময়ই 'জামায়াতে হুর' গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে এ

দলটি উপমহাদেশে ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ, আজাদী আন্দোলন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বালাকোটে সাইয়েদ ব্রেলভীর শাহাদতের পরও সিন্ধুতে তাঁর মিশনের কার্যক্রম জারী থাকে। এমনকি সাইয়েদ শহীদের পরিবার পরিজনও পরবর্তী ছয় সাত বছর পীর গো[illegible] হযরত সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহর কাছে অবস্থান করে। এছাড়াও হযরত সাইয়েদ হাসান শাহ জীলানীর ইমারতের বাইআত ও জিহাদ এবং পাটন মানারার জিহাদ ও বেলুচিস্তানের জিহাদে কাদেরিয়া রাশেদিয়ার বুযর্গদের অংশগ্রহণ এবং জিহাদের অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন দল ও গ্রুপকে সর্বক্ষণ তৈরি রাখা এ আন্দোলনেরই ফসল ছিল। পরবর্তীকালে এটিই হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির রেশমী রুমাল আন্দোলনের রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইংরেজের জুলুম শাসনের বুকে এক ভীতির কাঁপন ছড়িয়ে দেয়।

হযরত হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীকের সাথে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের 'জামায়াতে মুজাহিদীন'-এর গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। নিজের পীর ও মুরশিদের হাতে তিনি যে জিহাদের বাইআত করেছিলেন তার মূল বিষয় ছিল তাওহীদের প্রচার ও মুহাম্মদী শরীয়াতের প্রবর্তন। তাই সর্বাগ্রে তিনি শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। পাটন মানারার জিহাদ ছিল এ কার্যক্রমের একটি অংশ।

হাফেজ সাহেব নওমুসলিম ও এতিম ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল ছিলেন। উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর ইসলাম গ্রহণ করার পর এ অল্প বয়স্ক ও নওমুসলিম কিশোরের প্রতি তাই তিনি তাঁর স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। তার সাথে এ মমতার সম্পর্কের জন্য এ কিশোরটি হামেশা গর্ব করে এসেছে। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোয় বলতেন, আমার সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের নির্বাসিত জীবনে দুনিয়ার বহু দেশ ঘুরেছি কিন্তু কোথাও হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীক এবং আমার উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মতো মুরশিদ ও উস্তাদ আর পেলাম না।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধী শিখ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করে ধন্য হলেন। তিন চার মাস হযরত হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীকের কাছে অবস্থান করলেন। রুখসাত হবার সময়ের কথা বর্ণনা করে নিজেই বলেন ঃ

'আমাকে বলা হলো, হযরত আমার জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন এ মর্মে যে, আল্লাহ যেন উবাইদুল্লাহকে কোনো বিশেষজ্ঞ আলেমের সাথে সংযুক্ত করে

দেন। আমার মনে হয়েছে আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাই আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব রহমত ও করুণাধারায় সিঞ্চন করে আমাকে পৌঁছিয়ে দেন হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের খিদমতে। আল্লাহ্‌র আর একটি বিশেষ মেহেরবানী হচ্ছে এই যে, আমার মুরশিদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা মতাদর্শ উস্তাদ হযরত শায়খুল হিন্দের অনুরূপ ছিল। অন্যথায় রাজনৈতিক কাজ করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়তো।

ভরচুণ্ডী থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাহাওয়ালপুর রাজ্যের একটি গ্রামের মসজিদে আরবীর প্রাথমিক বইগুলো পড়তে শুরু করলাম। এভাবে পড়তে পড়তে দীনপুর পৌঁছে গেলাম। এখানে সাইয়েদুল আরেফীন হাফেজ মুহাম্মদ সিদ্দীকের খলীফা মাওলানা আবুস সিরাজ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব অবস্থান করতেন। তিনি আমার আম্মাজানের কাছে পত্র লেখালেন। আম্মাজান এসে গেলেন। তিনি আমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অনেক চেষ্টা তদবির করলেন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি অবিচল থাকলাম। এখানে একজন নবাগত ছাত্রের কাছ থেকে হিন্দুস্তানের আরবী মাদরাসাগুলোর অবস্থা জেনে নিলাম। তারপর মুজাফ্‌ফরগড় থেকে রেলে উঠে সোজা দেওবন্দে পৌঁছে গেলাম। দারুল উলুমে ভর্তি হয়ে হযরত শায়খুল হিন্দের ছাত্র দলভুক্ত হলাম।'

মাওলানা উবাইদুল্লাহ পঁচিশ বছর বয়সে সিন্ধু থেকে ইল্‌ম হাসিল করার জন্য দেওবন্দে পৌঁছেন। কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত ইসলামী ইলমে পারদর্শিতা অর্জন করেন। আরবী ভাষা শেখেন। তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। ফিকহ্, মানতিক ও ফাল সফায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দারুল উলুমের সাথে তাঁর মন বাঁধা পড়ে গেলো। সেখানে শিক্ষা ও অধ্যয়ন তাঁকে পাকাপোক্ত ও পরিপূর্ণ মুসলিম ও মুমিনে পরিণত করলো। আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছুবার এ পথটিই একমাত্র সোজা ও সরল পথ বলে তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো।

দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া শেষ করে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধুতে ফিরে এলেন। ছয় সাত বছর সেখানে একটি মাদরাসায় ছাত্রদের পড়াতে থাকলেন। তিনি নিজে একটি মাদরাসও কায়েম করলেন। ছাত্র সংগ্রহ করলেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যয়ভার নিজে বহন করতে থাকলেন। এ পর্যন্ত তিনি দীনের যে মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করেছিলেন তা সযত্নে বিতরণ করতে লাগলেন। দিন রাত এ কাজেই ব্যাপৃত থাকলেন। এ সময় পরিস্থিতি হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেলো। উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ওলটপালট হতে থাকলো। স্বাধীনতা সংগ্রামী উলামায়ে কেরাম তাদের দলবল সংগঠিত করতে থাকলেন। বৃটিশ শাসনের অক্টোপাশ ছিন্ন করে আজাদী হাসিলের সংগ্রামে

জানপ্রাণ কুরবানী করার অভিযান শুরু হয়ে গেলো। অভিযানের সূচনা হলো দারুল উলম দেওবন্দ থেকে। এতে নেতৃত্ব দিলেন বয়োবৃদ্ধ আলেম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান। শায়খুল হিন্দ পঞ্চাশ বছর থেকে দারুল উলূমে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। তাই তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্র ও গুণগ্রাহী এবং প্রাণ উৎসর্গকারী ভক্ত-অনুরক্তদের বিশাল বাহিনী তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এদের সংখ্যা লাখের কম ছিল না। তাঁর ছাত্রদল ছড়িয়ে ছিল সারা হিন্দুস্তানে। এমনকি আফগানিস্তানেও এ ধরনের মুজাহিদ ও প্রাণ উৎসর্গকারীদের সংখ্যা কম ছিল না। শায়খুল হিন্দের একটি মাত্র ইশারায় তারা মাথায় কাফন বেঁধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল। শায়খুল হিন্দ সাধারণত এদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে স্বাধীনতা আন্দোলনের মিশনে শরীক করেছিলেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন এ প্রাণ উৎসর্গকারীদের অন্যতম। শায়খের নির্দেশ এলো, এখনই দেওবন্দে চলো। শাগরিদ সাথে সাথেই কাপড় চোপড় ঝেড়ে ঝুড়ে বোঁচকা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সংগ্রামের পথে, জীবন উৎসর্গ করার পথে।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দুর্বল শারীরিক কাঠামোর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) ভাষায় ঃ 'তিনি ছিলেন ইলমের সমুদ্র এবং রাজনীতিতে গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি চাচ্ছিলেন ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে।'

শায়খুল হিন্দের গোপন আন্দোলন

১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর বৃটিশ ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা বেশী দিন চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। উনবিংশ শতক শেষ হতে না হতেই তারা আবার সংগ্রামের পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এবারের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন শায়খুল হিন্দ 'হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান।' প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই তাঁর প্রচেষ্টা শুরু হয়। দেওবন্দ মাদরাসার সদর মুদাররিস থাকাকালেই তিনি সেখানে 'জমিয়তুল আনসার' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। যুব সমাজের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য তাঁর তরুণ ছাত্র মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে নিযুক্ত করেন এর সেক্রেটারী জেনারেল। জমিয়তুল আনসারের সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি দেখলে সহজেই অনুভূত হবে যে, এটা বাহ্যত একটি দাওয়াত ও তাবলীগের সংগঠন হলেও আসলে এ সংগঠনের মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা হচ্ছিল এবং এর আওতাধীনে তথ্য পরিবেশন ও প্রচারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তার মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করা এবং মুসলমানদের হারানো রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনরদখলের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শায়খুল হিন্দ চাচ্ছিলেন ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেশে একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে। আফগানিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সীমান্তের স্বাধীন গোত্রগুলো থেকে যেসব ছাত্র দেওবন্দে পাঠরত ছিল তাদের মধ্যে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন।

মাওলানা সিন্ধী চার বছর ধরে দেওবন্দে অবস্থান করে জমিয়তুল আনসারের ভিত্ মজবুত করতে থাকেন। এ আন্দোলনের শুরুতে তার সাথে সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত হন মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক সিন্ধী, মাওলানা আবু মুহাম্মদ আহমদ লাহোরী এবং মাওলানা আহমদ আলী। তারপর কাজের সুবিধার জন্য এর কেন্দ্র দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে সেখানে পাঠানো হয়। ১৯১৩ সালে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় 'নাযারাতুল মাআরিফ।' এর পৃষ্ঠপোশকতায় হযরত শায়খুল হিন্দের সাথে আরো যারা থাকেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ হাকিম আজমল খান ও নওয়াব ভিকার উল-মূল্ক। মাওলানা সিন্ধী লিখেছেন ঃ 'হযরত শায়খুল হিন্দ যেভাবে চার বছর আমাকে দেওবন্দে রেখে সাংগঠনিক শিক্ষা দেন ঠিক তেমনি দিল্লীতে এনেও তৎকালীন মুসলিম সমাজের যুব শক্তির সাথে আমাকে পরিচিত করেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি ডাঃ আনসারীর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ডাঃ আনসারী আমাকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন। এভাবে প্রায় দু বছরের মধ্যে আমি ভারতবর্ষের মুসলমানদের উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতির সাথে একাত্ম হয়ে পড়ি।

১৯১৫ সালে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে তিনি কাবুল যান। কাবুল যাবার আগে সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ ও ইয়াগিস্তান সফর করেন। গোপন পথে কাবুল পৌছার পরই তিনি শায়খুল হিন্দের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অবগত হন। তিনি জানতে পারেন, গত পঞ্চাশ বছর থেকে শায়খুল হিন্দ একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সেই দলের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

হিন্দুস্তানে শায়খুল হিন্দের ইংরেজ বিরোধী গোপন তৎপরতা আসলে ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। মাওলানা সিন্ধী শায়খুল হিন্দের এ তৎপরতাকে হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে এ তৎপরতাগুলো দুভাগে বিভক্ত ছিল ঃ দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে। দেশের বাইরে বলতে উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য এলাকাগুলো—যেগুলো আফগান ও বৃটিশ উভয় সরকারের কর্তৃত্ব সীমার বাইরে অবস্থান করছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে এ এলাকাগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনের তৎপরতা ব্যাপকতর করা হয়। এ সময় ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে বাইর থেকে সেই আগুনে ঘি ঢালার এবং বাইর থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করা হয়। যুদ্ধ চলাকালে হযরত শায়খুল হিন্দ কাবুলে এ তৎপরতার একটি কেন্দ্র খুলতে চান। এজন্য তিনি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে গোপনে কাবুলে পাঠান। সেখানে শায়খুল হিন্দের অসংখ্য শাগরিদ ছিলেন এবং অপরদিকে সিন্ধু ও সীমান্তে মাওলানা সিন্ধীরও বহু গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁরা সবাই এ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। আসলে জমিয়তুল আনসার সংগঠনের সাহায্যে ভেতরে ভেতরে এ আন্দোলনটিকে শক্তিশালী করা হচ্ছিল। কিন্তু বাইরে এ আন্দোলনটি কতটুকু শক্তি অর্জন করেছিল এবং আদৌ এ আন্দোলনটি আছে কি না সে সম্পর্কেও মাওলানা সিন্ধী বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে শায়খুল হিন্দ এ আন্দোলনটির শক্তি বৃদ্ধি করে যেতে থাকেন। এমনকি মাওলানা সিন্ধীকে কাবুলে পাঠাবার আগে একদিন শায়খুল হিন্দ তাকে ডেকে বললেন, 'উবাইদুল্লাহ ! তুমি কাবুলে চলে যাও।' কিন্তু

উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে মাওলানা সিন্ধী বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং যাবার কারণ জিজ্ঞেস করেন। শায়খুল হিন্দ কোনো কথা না বলে চলে যান। দ্বিতীয় দিন শায়খুল হিন্দ আবার বলেন ঃ 'উবাদুল্লাহ ! তুমি কাবুলে চলে যাও!' মাওলানা সিন্ধী এবারও কারণ জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু শায়খুল হিন্দের চেহারায় ক্রোধের ভাব দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি চিন্তা করতে থাকেন। মাওলানা সিন্ধীর পেরেশানী বেড়ে যেতে থাকে। তিনি মনে মনে দুঃখ করতে থাকেন শায়খের কথা না মানার কারণে। বরং তিনি কামনা করতে থাকেন আর এবার যদি তাঁকে বলা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যি 'হ্যাঁ' বলে দেবেন। ফলে তৃতীয় দিন শায়খুল হিন্দ পুনরায় একই নির্দেশের পুনরুক্তি করার সাথে সাথেই তিনি যেতে রাজী হয়ে যান। এভাবে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বের যাবতীয় ব্যাপার গোপন রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর গোপন সফর

উপমহাদেশের শাসন কর্তৃত্ব থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করার জন্যে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান যে গোপন তৎপরতা ও আন্দোলন চালান ইতিহাসে তা 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' নামে খ্যাত। ইংরেজ শাসকরা রোল্‌ট এ্যাক্ট কমিটির সাহায্যে এ সম্পর্কিত যে রিপোর্ট তৈরি করে তা থেকেও এ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হচ্ছে এই : "এটা ছিল একটা প্রস্তাব এবং এ প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছিল হিন্দুস্তানে বসেই। এর উদ্দেশ্য ছিল, ওদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি আক্রমণ হবে এবং এদিকে সারা হিন্দুস্তানের মুসলমানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং হিন্দুস্তানে ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করবে।" রোল্‌ট এ্যাক্ট কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শায়খুল হিন্দ যে কোনো প্রকারেই হোক হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজ শাসন উৎখাতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি সীমান্তের স্বাধীন পাঠান জির্গাগুলোর এবং কাবুল, তুর্কী ও ইরান সরকারের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে তাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করছিলেন।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলো তখন শায়খুল হিন্দের জামায়াতের কেন্দ্র ছিল ইয়াগিস্তান। মাওলানা সাইফুর রহমান, হাজী তরঙ্গ যই এবং অন্যান্য মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন। তারা দীর্ঘদিন থেকে জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করছিলেন। শায়খুল হিন্দ তাদের জানিয়ে দিলেন, এখন আর বসে থাকা চলবে না, এবার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মাথায় কাফন বেঁধে সীমান্তের দিকে এগিয়ে এসো। তারা জানিয়ে দিল, আপনার নেতৃত্বে আমরা প্রাণ দেবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত। কিন্তু শায়খুল হিন্দ ভারতের অভ্যন্তর থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার কারণে পথ-ঘাটও দুর্গম হয়ে উঠছিল। এ সময় সীমান্তে মুজাহিদদের চলাফেরা ও সমাবেশ দেখে ইংরেজ সেনারা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসলো। মুজাহিদরা তাদের মোকাবিলা করলো। চূড়ান্ত মোকাবিলা করলো। ইংরেজদের পল্টনের পর পল্টন নিশ্চিহ্ন করে দিল। ইংরেজরা বাইরে তাদের এ ক্ষতির কথা প্রকাশ করলো না। কিন্তু তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও সেনাবাহিনীর কমতি ছিল না। তারা নতুন সাহায্য এনে যুদ্ধের ময়দান ভরে তুললো। তাদের পঙ্গপাল সেনাদলের মোকাবিলা করা সীমিত সংখ্যক মুজাহিদদের পক্ষে সম্ভব হলো না। আর বিশেষ করে মুজাহিদদের পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হবার আগেই তাদের

ওপর আক্রমণ চালানোর কারণে তারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ইয়াগিস্তানের এ মুজাহিদরা ছিলেন নিঃস্ব। বাইরের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে বেশীক্ষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে টিকে থাকা সম্ভবপর ছিল না। খাদ্য শেষ হয়ে গেলে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে হতো। ফলে ইয়াগিস্তান থেকে শায়খুল হিন্দের কাছে আবেদন করা হলো, কোনো সুসংগঠিত ও শক্তিশালী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আমাদের এ সাহসিকতা ও আত্মদান অর্থহীন হয়ে পড়ছে। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে পাঠানো হলো আফগান সরকারের সাহায্য সহায়তা লাভ করার উদ্দেশ্যে। আর শায়খুল হিন্দ নিজেই তুরস্ক সফরের পরিকল্পনা করলেন।

ওদিকে ইংরেজের গোয়েন্দা বাহিনী দেওবন্দে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের পেছনে এবং দিল্লীতে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর পেছনে জোঁকের মতো লেগে ছিল। ইংরেজ গোয়েন্দার চোখে ধূলো দিয়ে ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে কাবুলে পৌঁছে যাওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। এ সফরে মাওলানা সিন্ধীর তিন থেকে চার মাস সময় লাগলো। সিন্ধুতে ছিলেন কাদেরিয়া নক্শবন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়া সিলসিলার প্রখ্যাত বুযর্গ হযরত মাওলানা সাইয়েদ গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী। মাওলানা সিন্ধী ইতিপূর্বে তাঁর হাতে বাইআত হয়েছিলেন। মাওলানা দীনপুরী ও মাওলানা মাহমুদুল হাসানের মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক ছিল। কাজেই মাওলানা সিন্ধীর পক্ষে কাবুলের পথে সিন্ধুতে মাওলানা দীনপুরীর খেদমতে হাযির হওয়া মোটেই বিচিত্র ছিল না। বরং গোয়েন্দার চোখে ধূলো দেবার জন্যে এটাই ছিল সহজ পথ। মাওলানা সিন্ধী পীরের কাছে তাঁর প্রোগ্রামের কোনো আলোচনাই করেননি। কিন্তু পীর নিজেই তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি ব্যাপার মৌলভী উবাইদুল্লাহ ! এখনো তুমি কাবুলে যাওনি ?' মাওলানা সিন্ধী একটু অবাকই হলেন। তিনি শুধু এতটুকু বললেন, 'হযরতের যিয়ারতের জন্য এসেছি, কয়েকদিন পরে বিদায় নেবো।' একথা শুনে হযরত দীনপুরী বললেন ঃ 'না এখনো নয়, কয়েকদিন আমার এখানে থাকো।'

হযরত দীনপুরীর অনুমতি পেয়ে মাওলানা সিন্ধী এক মাস দীনপুরে থাকলেন। তখন ছিল রমযান মাস। দীনপুরে মাওলানা সিন্ধীর অবস্থান গোপন রাখা হয়েছিল। কয়েকজন বিশেষ লোক ছাড়া কেউ তাঁর অবস্থান জানতো না। একদিন হযরত দীনপুরী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী সাথে সাথেই তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। দেখলেন তাঁর পীর ও মুরশিদ কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তিনি আদবের সাথে বসে পড়লেন। হযরত মুখে কিছু বললেন না। তাবিজের মত লেখা কাগজের একটা টুকরো তাঁর হাতে দিলেন। তাতে নিচের কবিতাটি লেখা ছিল ঃ

জাঁ বাজাঁ না দেহ্ ওয়াগর নাহ্ আয তু বাস্ তানদ আজল্
খোদ তু মুনসিফ বাশ আয় দিল্ইঁ নেকো ইয়া আঁ নেকো

অর্থাৎ 'প্রাণ তুলে দাও প্রিয়ের হাতে
নয়তো মৃত্যু কেড়ে নেবে তাকে,
এখন তুমি নিজে করো ইনসাফ
কোন্টা ভালো–এটা অথবা ওটা ?'

এ ইংগিত পেয়েই মাওলানা সিন্ধী সফরের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত মানসিক যন্ত্রণারও অবসান হলো। এমন গোপন পথে এবং সব ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা করে তিনি কাবুলে পৌছলেন যে, ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ এক বছর পর্যন্ত জানতেই পারলো না। মাওলানা সিন্ধী কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন।

রেশমী রুমাল আন্দোলন

হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সিন্ধুর মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী ও মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ আমরুটির অবদান অবিস্মরণীয়। এ ব্যাপারে মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের সাথে তাঁদের যোগাযোগ হয়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মাধ্যমেই এ যোগাযোগ কায়েম থাকে। এ সময় দেওবন্দের পরে দীনপুর স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় গোপন কেন্দ্রে পরিণত হয়। দীনপুরের মাধ্যমে সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকায় এ সংগ্রামের বার্তা পৌছতে থাকে। চতুরদিকে গোপনে জিহাদের প্রস্তুতি চলতে থাকে। হযরত দীনপুরি এতবেশী গোপনীয়তা রক্ষা করে অস্ত্র সংগ্রহ, মুজাহিদদের ট্রেনিং ও অর্থ সরবরাহ করছিলেন যে, তাঁর অতি নিকটতম লোকেরাও তা জানতে পারছিল না। মসজিদের সদর দরজার নিচে ভূগর্ভে একটি গোপন কুঠরীতে স্থাপন করেছিলেন অস্ত্র কারখানা। রাতদিন ২৪ ঘন্টা সেখানে কাজ চলতো। সেখানে অস্ত্র ও গোলা বারুদ তৈরি হতো। সে সময় সমগ্র বৃটিশ ভারত ইংরেজের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী। সারা দেশে যেন গোয়েন্দার জাল বিছানো ছিল। ইংরেজের এ সমগ্র গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনার চোখে ধূলো দিয়ে নেতৃবর্গের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, গোপন পয়গাম আদান প্রদান, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর গোপনে যাওয়া আসা, তার কাবুল রওয়ানার আগে কয়েক মাস দীনপুরে অবস্থান, তারপর দীনপুর থেকে তাঁর আফগানিস্তান রওয়ানা হবার গোপন ব্যবস্থাপনা, বিপ্লবী মুজাহিদদের গোপন কার্যকলাপ—সবকিছুই চলছিল সফলতার সাথে।

শায়খুল হিন্দের জিহাদ আন্দোলনের এ ছিল এক চমৎকার ব্যবস্থাপনা। শত শত মাইল দূরে দেওবন্দে বসে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত থেকেও মাওলানা মাহমুদুল হাসান যা চিন্তা করতেন, যে নির্দেশ দিতেন তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দোলনের গোপন কেন্দ্রসমূহে পৌছে যেতো। এ গোপন ব্যবস্থাপনার ফল আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি—মাওলানা সিন্ধী কাবুল রওয়ানা হবার আগে দীনপুরে এসেছেন এবং কোনো কথা বলার আগেই মাওলানা দীনপুরী তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ মৌলভী উবাইদুল্লাহ, তুমি এখনও কাবুল যাওনি ?

১৯১৫ সালের ১৫ আগষ্ট মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী আফগানিস্তানের সীমান্তে পা রাখেন। তাঁর সাথে ছিলেন শায়খ আবদুর রহীম সিন্ধী। মাওলানা

সিন্ধী এপ্রিল মাসে দিল্লী থেকে বের হন। চার মাস বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পর দীনপুর থেকে উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের অনাবাদ মরু অঞ্চল ও পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করেন। প্রথমে কান্দাহার পৌছেন। সেখানকার গভর্নর সরদার মুহাম্মদ ইউনুস খানের সহায়তায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কাবুলে পৌছেন। তখন আফগানিস্তানের শাসক ছিলেন আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান। হাবীবুল্লাহ্ খানের সাথে সাক্ষাত করে তিনি শায়খুল হিন্দের প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। ১৯০৬ সালের ১৬ মার্চ মৌলভী আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ সিন্ধী ও আরো কয়েকজন ভারতীয়ের পত্র নিয়ে কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে আসেন। সেই পত্রে হযরত দীনপুরীকে আফগানিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে হযরত দীনপুরী যেতে পারেননি। তবে তিনি আফগানিস্তানের আমীরের কাছে পত্র লেখেন এবং হলফ উঠান যে, যখনি আফগানিস্তান হিন্দুস্তানের ওপর আক্রমণ চালাবে তখনই তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করবেন।

হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে যে জিহাদ আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তার সাথে হযরত দীনপুরীর গভীর সম্পর্ক ছিল। আফগানিস্তান, দেওবন্দ ও দীনপুরের মধ্যে তখন গোপন পত্র যোগাযোগ ছিল এবং প্রায়ই আফগানিস্তান থেকে গোপন খবর নিয়ে সংবাদ বাহকরা দেওবন্দ ও দীনপুরে আসা যাওয়া করতো। মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ সিন্ধী কাবুল থেকে এসব সংবাদ গোপন পত্রের মাধ্যমে শায়খ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠাতেন। এ পত্রগুলো রেশমী কাপড়ের ওপর গোপন পদ্ধতিতে লেখা হতো বলে ইংরেজ সরকার একে 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র' নামে আখ্যায়িত করেন।

১৯১৬ সালে মুলতানের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর রব নওয়াজ খান তিনটি রেশমী পত্র হস্তগত করতে সক্ষম হন। এ পত্র তিনটি তাঁরই ছেলেদের গৃহ শিক্ষক আবদুল হকের কাছে পাওয়া যায়। আবদুল হক সে সময় ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করে আফগান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য খান বাহাদুর সাহেব এ রেশমী পত্র তিনটি মুলতান ডিভিশনের কমিশনারের হাতে সোপর্দ করেন। প্রথমে কমিশনার সাহেব এটাকে কোনো গুরুত্ব দেননি। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতার মাধ্যমে তিনি যখন এ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন আতংকিত হয়ে পাঞ্জাব গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ টমিকন্সের হাতে পত্রগুলো দেন। আবদুল হকের ওপর চরম পুলিশী জুলুম চলতে থাকে। খান বাহাদুর রব

নওয়াজ খানকে সরকারী পর্যায়ে বিশেষ সম্মানীয় সনদ ও পুরস্কার দেবার কথা বিবেচিত হয়।

ওদিকে লোহার শলাকা পুড়িয়ে আবদুল হকের শরীরে বিদ্ধ করা হতে থাকে। অত্যাচারের আধিক্যে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। রেশমী রুমাল হস্তগত হবার সাথে সাথে বৃটিশ সরকার অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। ভারতীয় মন্ত্রী পরিষদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ভারতের ভাইসরয়, প্রাদেশিক গভর্নর ও সেক্রেটারীদের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খবরাখবর, প্রমাণ পত্রাদি ও বিধি নির্দেশ আদান প্রদান হতে থাকে। দিল্লী থেকে লণ্ডন পর্যন্ত সরকারী তৎপরতা ও গোপন খবর আদান প্রদান বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরান, হিজায ইত্যাদি বাইরের বিভিন্ন দেশে বৃটিশ সরকার নিজেদের লোক মোতায়েন করে। সরকারী তৎপরতা দেখে মনে হতে থাকে, ভারতে বুঝি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন অত্যাসন্ন।

হযরত দীনপুরীর গ্রেফতারী

হযরত শায়খুল হিন্দের আফগান শাসকদের সহায়তায় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসন উৎখাত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবার সাথে সাথেই বৃটিশ সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। পেশোয়ার, পাঞ্জাব, সিন্ধু, দিল্লী ও কলকাতায় এ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত লোকদের ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী শুরু হয়। এভাবে দিল্লীতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলীকে এবং কলকাতায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতার করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক ও আধা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করা হয়। সিন্ধু থেকে পীর আসাদুল্লাহ শাহ, হাজী শাহ বখ্‌শ ও মাওলানা তাজ মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়। হযরত দীনপুরীর গ্রেফতারের ঘটনা ছিল বড়ই চমকপ্রদ।

দীনপুরে তখন নিশুতি রাত। গভীর আঁধারে ঢাকা চারদিক। হযরত দীনপুরীর অসংখ্য মুরীদান, যাদেরকে 'ফকীর' বলা হতো, রাত জেগে ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল। তাদের হুজরাগুলো থেকে উত্থিত যিকরুল্লার ধ্বনি সমস্ত আকাশ বাতাস মুখরিত করছে। হযরত দীনপুরী তাঁর গৃহে আরাম করছেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার বুক চিরে একটি লোকের সচল ছায়া দেখা গেলো। সে চলছে হযরত দীনপুরীর গৃহের দিকে। আড়ালে হযরত দীনপুরীর বিশেষ খাদেমের সাথে কথা বলছে সে। এ ব্যক্তি হচ্ছে মিয়া শামসুদ্দীন। আজাদী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। সে হযরত দীনপুরীকে জানালো, তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন ভর্তি পুলিশ ইংরেজ অফিসারদের সহ এইমাত্র খানপুর ষ্টেশনে নেমেছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর। হযরত দীনপুরী মৌলভী আবদুল্লাহ লিগারীকে জানালেন। পরামর্শের জন্য অস্ত্রাগারের ইনচার্জ মৌলভী আবদুল কাদেরকে ডেকে আনা হলো। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো মৌলভী আবদুল্লাহকে অত্মগোপন করতে হবে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের মজুদ রসদ লুকিয়ে ফেলতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমগ্র এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত লোক জেগে উঠলো। হযরত দীনপুরীর মুরীদান 'ফকীর' গোষ্ঠী এবং জিহাদ আন্দোলনের সাথে জড়িত কর্মীবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে ফেলার কাজে নিয়োজিত হলো। শেষ রাতের দিকে তারা সবাই যার যার হুজরায় ও ঘরে ফিরে এসে তাহাজ্জুদ নামায ও যিকির আযকারে মশগুল হলো। চতুরদিকে স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করতে লাগলো। কোথাও কোনো ভীতি বা আশংকার চিহ্ন দেখা গেলো না।

মসজিদের মিনার থেকে মুয়ায্যিন সবেমাত্র আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেছে এমন সময় সমগ্র এলাকাটি পুলিশ ও সেনাবাহিনী অবরোধ করে ফেললো। লোকজনের চলাফেরা বন্ধ করে দেয়া হলো। হযরত দীনপুরী পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে মসজিদে জামায়াত সহকারে নামায পড়লেন এবং প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন। এমন সময় পঞ্চাশজন সিপাহী ও গার্ড সহকারে পাঞ্জাব ও বাহাওয়ালপুর রাজ্যের কয়েকজন ইংরেজ পুলিশ অফিসার তাঁর হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলো। তারা তাকে সালাম করে মুসাফাহা করলো। হযরত দীনপুরী বসে বসেই তাদের সাথে মুসাফাহা করলেন এবং তাদেরকে তার সাথে চাটাইয়ের ওপর বসার অনুমতি দিয়ে এভাবে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা আরজ করলো, আপনাকে একটু কষ্ট করে খানপুর ষ্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে। তাদের সাথে ছিল পাঞ্জাবের পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন আবদুল আজীজ এবং বাহাওয়ালপুর পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন গোলাম মহীউদ্দীন। তারা বললো ঃ মৌলভী আবদুল্লাহ লিগারীকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। আন্দোলনের কোনো একজন কর্মী গিয়ে আবদুল্লাহ লিগারির কানে কথাটি পৌছিয়ে দিল। আবদুল্লাহ তখন কোনো গোপন আস্তানায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মনে করলেন, হয়তো তাঁকে না পেয়ে সৈন্যরা হযরত দীনপুরীকে শাস্তি দেবে। তাই তিনি সাথে সাথেই গোপন স্থান থেকে বের হয়ে মসজিদে চলে এলেন। পুলিশ সাথে সাথেই তার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল। পুলিশের ওপর হযরত দীনপুরীর ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। পুলিশ অফিসাররা নীরবে চলাফেরা করছিল। ইতিমধ্যে যোহরের সময় হয়ে গিয়েছিল। অফিসাররা ভয়ে হযরত দীনপুরীকে বললো ঃ

"যদি মেহেরবানী করে হযরত একটু আমাদের সাথে ভেতরে তাশরীফ আনতেন তাহলে আমরা কিছু জিনিসপত্র তল্লাশী করতাম।"

"আমার যাবার প্রয়োজন নেই। ভেতরে পরদা করে দেয়া হয়েছে। আপনারা গিয়ে ইচ্ছেমতো তল্লাশী করে আসুন।" হযরত দীনপুরী সোজা জবাব দিলেন।

যাহোক পুলিশ সারা বাড়ী তল্লাশী চালালো। কিন্তু কিছুই পেলো না। এদিকে হযরত দীনপুরী পুলিশদের মেহমানদারীর দায়িত্ব নিলেন। লংগরখানায় নির্দেশ দিলেন, আজ যে শাক রান্না করা হয়েছে তা একটি করে রুটির ওপর রেখে এক একজন পুলিশকে দিয়ে দাও। অফিসারদের জন্য আলাদা খাবার ব্যবস্থা করলেন।

আসরের নামাযের পর হযরত দীনপুরী তাদের সাথে বের হয়ে পড়লেন। সমগ্র দীনপুরে হৈ চৈ পড়ে গেলো। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কিশোর নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক তাঁর পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে পুলিশ অফিসারদের চোখ কপালে উঠলো। ক্যাপ্টেন আবদুল আজীজ হযরত দীনপুরীর কাছে জনতাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আকুল আবেদন জানালেন। হযরত দীনপুরী জনগণকে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। তবুও ফকীরদের একটি দল তাঁর সাথে থাকলো। খানপুর থেকে ট্রেনযোগে লাহোরে এনে তাঁকে সেণ্ট্রাল জেলে আটক করা হলো। মৌলভী আবদুল কাদের ও মৌলভী আবদুল্লাহ্ লিগারিও তাঁর সাথে ছিলেন।

কারাগার নয় পরীক্ষাগার

একটি ছোট আঁধার কুঠরী। ভ্যাঁপসা গন্ধে ভরা। একান্ত নিসংগ কারাবাস। হযরত দীনপুরীকে প্রথমে এমনি একটি পরিবেশে লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি কারোর ছিল না। খাবারও তাঁকে ঠিকমতো দেয়া হতো না। একাদিক্রমে কয়েক বেলা তাঁকে শুকিয়ে রাখা হতো। নিসংগতা, ভ্যাঁপসা গরম, অনাহার ও নানান মানসিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁর কারাবাসের দিনগুলো এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এত কষ্ট দেবার পরও যখন তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও বের করা সম্ভব হয়নি তখন তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের সাথে রাখা হয়। এখানে সারাদিনের মধ্যে মাত্র একবার তাঁকে সামান্য কয়েকটি ভাজা ছোলা খেতে দেয়া হতো। এগুলো তিনি সাধারণত নিজের সাথের ভূখা কয়েদীদের খাইয়ে দিতেন। তদন্তকারী অফিসাররা সব সময় পেছনে লেগে থাকতো। আন্দোলনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকতো। কিন্তু তিনি কখনো মুখ ফুটে এমন কোনো কথা বলতেন না যা তাদের কাজে লাগতে পারতো। শারীরিক নির্যাতন লাভজনক হচ্ছে না দেখে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁর শারীরিক নির্যাতন কমিয়ে দেয়। তাঁর আরাম আয়েশের দিকে নজর দিতে থাকে। রাতে ব্যারাকের মধ্যে বন্ধ না থেকে বাইরে থাকার অনুমতি দেয় এবং কারাগারের মধ্যে যে কোনো জায়গায় ঘুরে বেড়াবার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়। কিন্তু এগুলো ছিল মূলত সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত ব্যবস্থা। আন্দোলন সম্পর্কিত গোপন কথাগুলো তাঁর কাছ থেকে টেনে বের করে নেবার জন্য এ অবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। দিনের বেলায় তাঁকে অন্যান্য কয়েদীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো, যাদের ওপর মারাত্মক ধরনের দৈহিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং সেখানে তাঁর সামনে আলোচনা করা হতো যে রাজনৈতিক বন্দীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার না করলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে অথবা টগবগ করে ফুটন্ত গরম তেলের কড়াইতে পড়ে জীবন দেবে। আর অপরাধ স্বীকার করে রাজসাক্ষী বনে গেলে তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হবে। এভাবে তাঁকে রাজসাক্ষী বানাবার প্রচেষ্টা চলে।

সাতাশ দিন পর্যন্ত লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট দেবার পর হযরত দীনপুরী ও মাওলানা আবদুল কাদেরকে জালিন্ধর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের আরো বহু বন্দীকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক জানার জন্য একদিন সন্ধ্যায় সমস্ত কয়েদীদেরকে একত্র করা হয় একটি খোলা ময়দানে। তাদের মধ্যে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীও ছিলেন। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীকে

দিল্লীতে নাযরাতুল মাআরিফিল কুরআনিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ছিলেন এ মাদরাসার শায়খুত্ তাফসীর। তিনি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর প্রিয় ছাত্র ও তাঁর আত্মীয়। তাকে দিল্লী থেকে গ্রেফতার করে প্রথমে লাহোরে তারপর সেখান থেকে জালিন্ধর জেলে পাঠানো হয়। একদিন বিকালে আসরের পর মাওলানাকে কামরার বাইরে আনা হয়। সেখানে তিনি নিজের মুরশিদ হযরত দীনপুরীকে দেখতে পান। হযরতকে দেখার সাথে সাথেই তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে হযরতের সাথে মুসাফাহা করার। কিন্তু তিনি এ উদ্দেশ্যে সবেমাত্র দুকদম বাড়িয়ে ছিলেন এমন সময় দেখতে পান হযরত দীনপুরী তাঁর দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন যাতে মনে হচ্ছে তিনি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী হযরত দীনপুরীর চোখের ভাষা বুঝতে পারেন। এ সময় তাঁর সাথে দেখা করা সঙ্গত নয় মনে করে তিনি কল থেকে পানি আনার উদ্যোগ নিয়ে ঝট করে চোখ ও চেহারা ঘুরিয়ে সোজা কলের দিকে চলে যান। কিন্তু যতটুকু সময় মাত্র তিনি হযরত দীনপুরীর দিকে তাকাতে পেরেছিলেন তাতেই তাঁর মনের সমস্ত ক্লেদ দূরীভূত হয়ে সেখানে জন্ম নিয়েছিল একটি অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দ ও প্রশান্তি।

শায়খুল হিন্দের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান একটি মহান লক্ষে এগিয়ে চলছি-লেন। এ লক্ষে পৌঁছার জন্য তিনি নিজের সমমনা আলেমদের একটি বিরাট দল, তাঁর বিপুল সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ ছাত্রবৃন্দ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুঃসাহসিক স্বাধীনচেতা পাঠান নেতৃবৃন্দের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে মাত্র আশি-পঁচাশি বছর আগে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এ সীমান্ত এলাকা থেকেই। এখানেই ছিল তাঁর কেন্দ্র। বহু স্বাধীনচেতা পাঠান নেতা ও গোত্রপতি তাঁর সাথে সরাসরি সংগ্রামে শরীক হয়েছিলেন। সীমান্ত এলাকায় সে ঘটনা তখনো তরতাজা ছিল। কাজেই কিছু স্বাধীনচেতা পাঠান নেতৃবৃন্দের সহায়তা লাভ করতে শায়খুল হিন্দকে বেগ পেতে হয়নি। তেমনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের সংগ্রামী আন্দোলনের প্রভাব হিন্দুস্তানের সমস্ত দীনী ও ইলমী কেন্দ্রগুলোয় তখনো যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। কাজেই সমগ্র দেশ থেকে একদল হক পরস্ত ও স্বাধীনচেতা আলেমের সমর্থনও তিনি পেয়েছিলেন। আর ছিল সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর বিশাল ছাত্র বাহিনী। তাঁর ছাত্র বৃন্দ ইতিপূর্বে তাঁর কাছ থেকেই মানসিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালকদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁর এ বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম ও আন্দোলন সমর্থন করতে পারেননি। তারা মনে করছিলেন এভাবে দারুল উলুম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার ওপর যে কোনো সময় সরকারী আপদ নেমে আসবে। শুরু থেকেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এ মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠাকে সুনজরে দেখতে পারেননি। এ মাদরাসা সংক্রান্ত ফাইলে তাদের কাছে একথাটি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল যে, এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম সারির নেতা। তাদের একজন ১৮৫৭ এর পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে একটি ছোট মফস্বল শহরে এ ইসলামী শিক্ষায়তনটির বুনিয়াদ রাখেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা নিছক মুসলমানদের দীনি তালীম তারবীয়াতের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি মাদরাসা হলেও মুসলিম যুব সমাজকে দীনি তালীম দেবার সাথে সাথে তাদের বুকে স্বাধীনতা ও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগুন জ্বালিয়ে দেয়াই ছিল এর একটি মহান উদ্দেশ্য। হয়তো এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম

নানুতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মনে মাদরাসার যে নক্‌শা পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে এ স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চিত্র তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। প্রধানত যে কোনো মূল্যে এ প্রতিষ্ঠানটি কায়েম রাখাই ছিল তাঁর লক্ষ। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের কায়েম থাকাই ভবিষ্যতের জন্য বিরাট এ্যাসেট হিসেবে বিবেচিত হয়। যাতে যে কোনো প্রকার পরিস্থিতির মুকাবিলা ও যে কোনো ধরনের সংগ্রামে সহায়তা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তার লক্ষেই এ ধরনের একটি দারুল উলুমের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।

তিনি শত্রুদের দৃষ্টি থেকে যে কোনোভাবে একে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তাই এর নকশাকে প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেননি। নইলে তাঁর মতো মর্দে মুজাহিদের সামনে আসল লক্ষ কখনো অস্পষ্ট থাকতে পারে না। তাছাড়া অল্প বয়সে অর্থাৎ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার কারণে এ লক্ষকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার সুযোগও তিনি পাননি। তিনি জীবিত থাকলে আমরা আশা করতে পারতাম তাঁর প্রিয়তম ছাত্র মাওলানা মাহমুদুল হাসানের জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্র চেতনার সংগ্রাম অতিবিলম্বে হলেও যে রূপে আত্মপ্রকাশ করছিল তা আরো ত্বরান্বিত হতো।

সীমান্ত এলাকার বহু নওজোয়ান মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাদের ওপর ছিল তাঁর প্রধান ভরসা। এছাড়াও সমগ্র হিন্দুস্তানের বিভিন্ন হকপরস্ত উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখদের সাথে তিনি নিজে এ ব্যাপারে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন অথবা তার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছাত্রদের সাহায্যে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কোনো একজন ছাত্রও তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের ব্যাপারে কোনো প্রকার অবহেলা বা গাফলতি প্রদর্শন করেছিলেন ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বরং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক প্রচেষ্টা ও প্রাণ উৎসর্গকারী সংগ্রাম সাধনার ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত প্রবলভাবে নড়ে উঠেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্বকালীন ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর সাথে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন যে, মাওলানা মাহমুদুল হাসান রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নামার প্রথমদিন থেকে তাঁর সামনে রেখেছিলেন কাজের একটি সুস্পষ্ট নকশা, একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী। হিন্দুস্তানে রাজনৈতিক কার্যক্রম যখন মাত্র সূতিকাগৃহের চৌকাঠ পার হতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল তখনই তিনি

তাঁর এ রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী। তিনি যদি এ পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী বাস্তবায়নের সক্ষম হতেন তাহলে আরো সিকি শতক আগেই ইংরেজকে হিন্দুস্তান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হতো এবং নিসন্দেহে বলা যায়, সেই আজাদ হিন্দুস্তানের চিত্রই হতো ভিন্নতর।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর অভিযানের ব্যর্থতা

চলতি দশকের শুরুতেই হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দের হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও প্রতিনিধি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে বসে ইংরেজের বিরুদ্ধে এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ইংরেজ এ কার্যক্রমকে ধ্বংস করে দেয়ার যাবতীয় সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল এ দেশীয় কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের সহায়তার কারণে। তাছাড়া খোদ কাবুলে সরকারও এক সময় গোপনে ইংরেজের সাথে হাত মিলায়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে বসে যা করেছিলেন তার প্রায় সমস্ত খবর গোয়েন্দা মারফত ইংরেজরা নিয়মিতভাবে পেয়ে যাচ্ছিল। মাওলানা সিন্ধীর লেখা রেশমী রুমাল পত্র প্রথমবার যখন গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে এলো তখন ইংরেজ বাহিনীর তৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলো। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্মকর্তা স্যার এ. হার্টজিল ভাইসরয়কে এ সম্পর্কিত যে রিপোর্ট প্রদান করেন তা অধ্যয়ন করলে বিস্ময়কর ঘটনাবলী সামনে এসে যায়। স্যার হার্টজিল একটি গোপন পত্রে ভাইসরয়কে লেখেন ঃ

"১৯১৬ সালে ১৪ আগষ্ট মুলতানের খান বাহাদুর রব নওয়াজ খান মুলতানের ডিভিশনাল কমিশনারকে হলুদ রেশমী কাপড়ের তিনটি টুকরো দেখান। তাতে উর্দুতে কিছু লেখা ছিল। তিনি বলেন, ৪ আগষ্ট থেকে এ টুকরাগুলো তার হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু কমিশনারের অনুপস্থিতির কারণে তিনি এগুলো উপস্থাপিত করতে পারেননি। খান বাহাদুর সাহেব বলেন, এ টুকরাগুলো আবদুল হক নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এই আবদুল হক ইতিপূর্বে তাঁর ছেলেদের গৃহ শিক্ষক ছিল এবং ১৯১৫ সালে তাঁর সাথে কাবুল সফর করেছিল। আবদুল হক খান বাহাদুর সাহেবকে এ পত্র পেশ করে বলে এ পত্র আমার জন্য তাকে কাবুল থেকে পাঠানো হয়েছে তার কাজ ছিল সিন্ধুর হায়দারাবাদে গিয়ে এ রেশমী রুমাল তিনটি মৌলভী আবদুর রহীমের হাতে সোপর্দ করে দেয়া। .... আবদুল হককে ভীতি প্রদর্শন করার পর সে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল।"

আবদুল হক তার দীর্ঘ জবানবন্দিতে যেসব লোকের নাম উল্লেখ করেছিল তার মধ্যে অনেক বড় বড় লোকের নাম এসে গিয়েছিল। ইংরেজের পুলিশ ও

গোয়েন্দা বাহিনী তাদের প্রত্যেকের পেছনে ধাওয়া করেছে। তাদের সমস্ত কাজের রেকর্ড তৈরি করেছে। মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধীর যেসব সাথি কাবুলে ছিলেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিদিনের কার্যকলাপের বিস্তারিত রিপোর্ট বৃটিশ সরকার পেয়ে যাচ্ছিল। এটাও একটা সত্য যে, আফগানিস্তান সরকার নিজেই ইংরেজদেরকে এসব খবর সরবরাহ করতো। এমন কি এক সময় মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী যখন যুবক আবদুল বারীকে রাশিয়ায় পাঠালেন তখন রাশিয়া সরকার তাকে গ্রেফতার করে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করলো। আবদুল বারীকে রাজ সাক্ষী বানানো হলো। এবং সে কাবুলে মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর সহযোগীদের যাবতীয় কার্যকলাপের রিপোর্ট নিজ হাতে লিখে ইংরেজ সরকারের সমীপে পেশ করলো। কাজেই তাকে কিছুদিন নজরবন্দী রাখার পর মুক্তি দেয়া হলো। রেশমী রুমাল আন্দোলনের ব্যর্থতায় এ ধরনের লোকেরাই বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এরা সামান্য লোভ বা ভীতি প্রদর্শনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো এবং সহজেই সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতো। সম্ভবত এদের ট্রেনিং যেমন মজবুত ছিল না তেমনি এদের মধ্যে যথার্থ ঈমানী দৃঢ়তা সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়নি।

আবদুল বারী ছিল পাঞ্জাবের জালিন্ধরের অধিবাসী। তার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ। ১৯১২ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর এম. এ.-তে ভর্তি হয়। ১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এতে ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্মানী ও তুর্কী মৈত্রী জোট গঠন করে। এ সময় তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থা খতম হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। মুসলিম ঐক্যের কেন্দ্র ও মুসলমানদের শেষ আশা ভরসাস্থল খিলাফত ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য সারা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আবেগ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবে এ আবেগ যায় শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে। এ সময় শায়খুল হিন্দ অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। ঠিক এ সময় ভারতে বৃটিশ সরকারের সমর্থনপুষ্ট "গ্রাফিক" নামক একটি ইংরেজী পত্রিকায় শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের একটি কার্টুন ছাপা হয়। তাতে দেখা যায়, শায়খুল হিন্দ ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দিচ্ছেন। এ কার্টুনে কালেমা তাইয়্যেবা ও ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়। এ পত্রিকাটা লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের লাইব্রেরীতে আসতো। এ পত্রিকা পড়ে একদল মুসলিম ছাত্রের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা শায়খুল হিন্দের জিহাদের আহ্বানে সাড়া দেয় তারা সিদ্ধান্ত নেয় হিন্দুস্তানে এ কুফরী স্থানে বসে ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না। এজন্য তারা আফগানিস্তান ও ইরান পার হয়ে তুরস্কে যাবার পরিকল্পনা করে। গভর্নমেন্ট কলেজের ছাত্র আল্লাহ নওয়াজ খান এ ব্যাপারে

গোপন সহায়তায় এগিয়ে আসে। আল্লাহ নওয়াজ খান হচ্ছে আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচিত ইংরেজের সহায়তাকারী খান বাহাদুর রব নওয়াজ খানের পুত্র। আবদুল হক ছিল তার ইতিপূর্বেকার গৃহ শিক্ষক। আবদুল হকের মাধ্যমে সে গোপন পথে কাবুলে যাবার সুযোগ পায়। আবদুল বারীর লিখিত জবানবন্দী থেকে জানা যায় ঃ

"দু-একদিন পরে আমি আল্লাহ্ নওয়াজ খানের কামরায় গেলে সেখানে আবদুল মজিদ খানকেও পেলাম। তিনি আমার হাতে কুরআন তুলে দিয়ে হলফ নিলেন যে, আমি তাদের সাথে হিন্দুস্তান থেকে হিজরাত্ করবো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাইরে যাবো কোন্ পথে, কিভাবে ? আমাকে বলা হলো, সেগুলো পরের ব্যাপার পরে হবে। ...... এরপর আল্লাহ্ নওয়াজ কিছু না বলেই লাহোর থেকে চলে গেলো। আবার কয়েকদিন পরে হঠাৎ ফিরে এলো নিজের ভাই শাহনওয়াজ খানকে সাথে নিয়ে। বললো, শাহনওয়াজও হিজরাত করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে।"

এভাবে দেখা যায়, আন্দোলনের ভিত মজবুত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। একদল উদ্যোগী যুবক এগিয়ে এসেছে। তারা প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাদের মনোবল মজবুত করার আগেই তাদের ওপর বড় বড় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যে ধরনের সংগ্রাম ও জিহাদে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে দীর্ঘ মেয়াদী ও কঠিনতর যে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন তাদের হতে হবে, এটা ছিল অবধারিত। অথচ এসব নওজোয়ানদের যে কোনো বৃহত্তম ও মারাত্মক বিপদের মুখেও মনোবল অটুট রাখার ট্রেনিং দিলে এবং সর্বোপরি এদের মধ্যে ঈমানী মজবুতী সৃষ্টি করলে আর এই সাথে কুফর ও ঈমানের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার যথার্থ রূপ তাদের সামনে তুলে ধরলে তার জন্য প্রাণ দিতে তারা কুণ্ঠিত হতো না। তাহলে শত্রুপক্ষের সামান্য নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন ও লোভ লালসার মুখে তারা এভাবে আত্মসমর্পণ করতো না।

এ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর দু দশক পার হতে না হতেই এরি হতাবশিষ্টের ওপর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে একই ঐতিহ্য ও স্বাধিকার চেতনা সমৃদ্ধ একই মাকতাবা-ই-ফিকরের (School of thoughts) আর একজন নওজোয়ান আলেম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহামাতুল্লাহি আলাইহি।

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

১। পুরানে চেরাগ ঃ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভ
২। তাযকিয়ায়ে মাশায়েখে দেওবন্দ ঃ মুফতী আযীযুর রহমান
৩। হায়াতে ইমদাদ ঃ মাওলানা আনওয়ারুল হাসান শেরকূটী
৪। সাওয়ানেহে কাসেমী ঃ মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী
৫। নক্‌শে হায়াত ঃ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী
৬। তাহরীকে শায়খুল হিন্দ ঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিঁয়া
৭। আহওয়ালুল আরেফীন ঃ হাফেয গোলাম ফরীদ
৮। সারগুযাশ্‌তে মুজাহিদীন ঃ গোলাম রসূল মেহের
৯। দুররে মান্‌সূর ঃ মৌলভী আবদুর রহীম সাদেকপুরী
১০। হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক ঃ ডঃ কিয়ামুদ্দীন আহমদ
১১। কাশওয়ানে ঈমান ও আযীমাত ঃ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী
১২। ইণ্ডিয়ান মুসলমানস ঃ উইলিয়াম হাণ্টার
১৩। আসীরে মালটা ঃ মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিঁয়া
১৪। আঠারো'স সাতাওয়ানকে মুজাহিদ ঃ গোলাম রসূল মেহের
১৫। তাযকিরাতুর রশীদ ঃ মাওলানা আশেক ইলাহী
১৬। ইয়াদে বাইদা ঃ হাজী উবাইদী দীনপুরী
১৭। ইফাদাতে মাওলানা সিন্ধী ঃ প্রফেসার মুহাম্মদ সারওয়ার জামেয়ী
১৮। মর্দে মুমিন ঃ আবদুল হামীদ খান

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।